জ্ঞানবিজ্ঞান

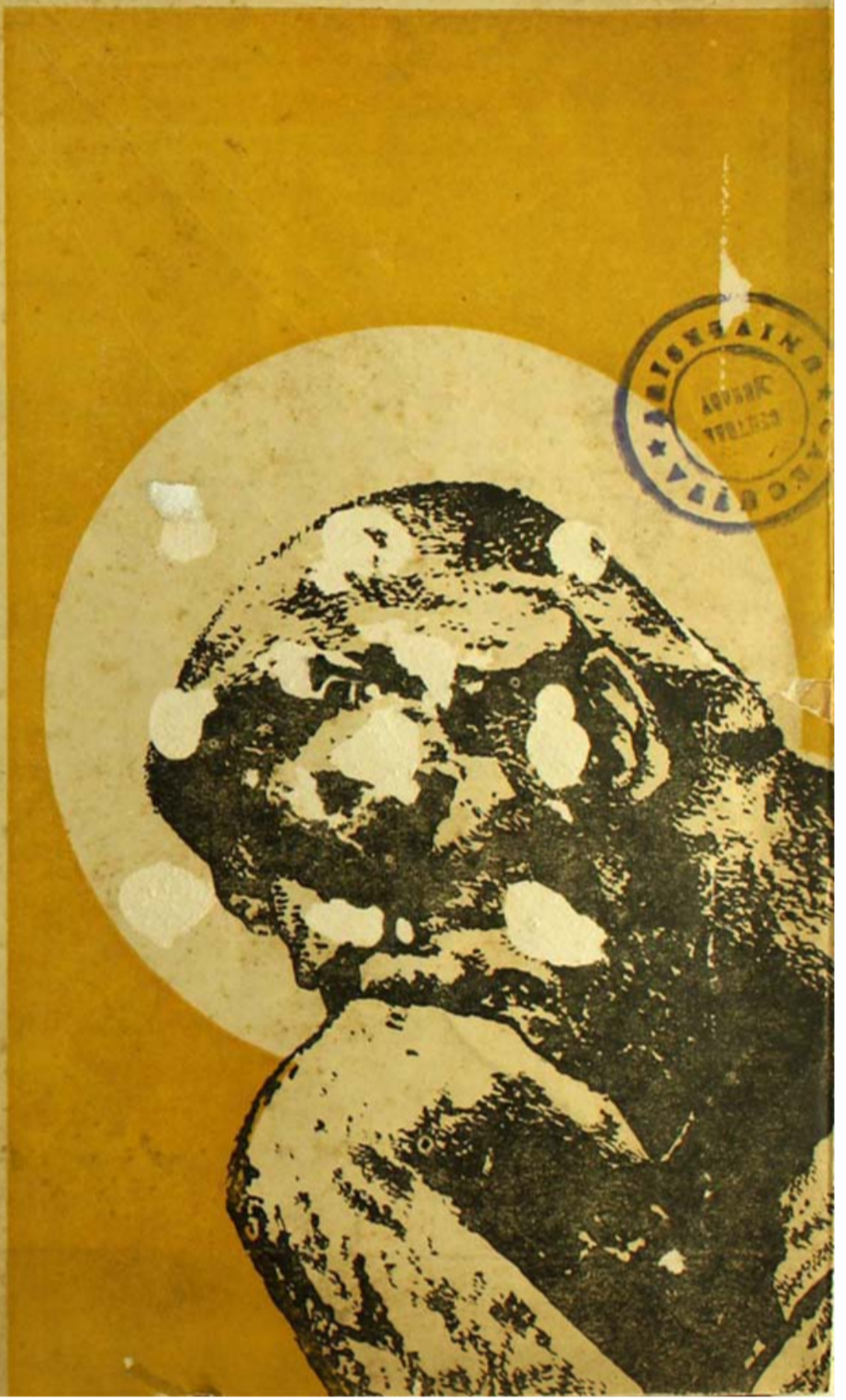

ন পাভলভ
ধির শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
মানবতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ
জিজ্ঞাসা

ান জীববিজ্ঞান সমাজ-
ধ আধুনিক ধারা পরি-
চালক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

আমরা শ্রমিক শ্রেণীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামী সাথী পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাই ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথমেই বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামের ফলে অর্জিত অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও অন্যান্য দাবীদাওয়ার আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণী গত চার বছরে একাধিক শিল্পে তাদের দাবীদাওয়া আদায়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের চটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ছাপাখানা শ্রমিকদের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে চটশিল্পের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির পরিমাণ মাসিক ৭১ টাকা। ঐ একই সময়ে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে মজুরী বৃদ্ধি ঘটেছে মাসিক ৪৬ টাকা এবং চা শিল্পের শ্রমিকরা পাচ্ছেন দৈনিক [illegible] বেশী। এছাড়া বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের আয়রন ফাউন্ড্রী ও চেরাইকলে ন্যূনতম বেতন [illegible] শ্রমিকরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

[illegible]মবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে শ্রম সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের [illegible]না ও অন্যান্য নীতির ফলে ধর্মঘট, ছাটাই, লক-আউট, লে-অফের সংখ্যা উল্লেখ-[illegible]লে শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

[illegible]থ্য থেকেই একথা সুস্পষ্ট যে গত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক দরদী কার্যকলাপের ফলে শুধু শ্রমিকশ্রেণীই উপকৃত হন নি, সঙ্গে রাজ্যের শিল্প পরিবেশও অনেক উন্নত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে শিল্প পরিবেশও উন্নত হবে, রাজ্যের শিল্পক্ষেত্র বন্ধ্যাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলবে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে সরকার সেই লক্ষ্যের দিকেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মানবমন-এর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডঃ নীহার মুখী
ডাঃ কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
ডাঃ এ. কে. সেন (পাটনা)
এস্. আর. দাশগুপ্ত
ডাঃ অজিত দেব
ডাঃ কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ডঃ অরুণা হালদার
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
ডঃ দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ সন্তোষ দাস
ডাঃ দীপক চন্দ
মেজর সত্যেন বোস
শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায়

মানবমন

বর্ষ—২১ সম্পাদক—দীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা —
সহঃ সম্পাদক—প্রবজ্যোতি মজুমদার
প্রকাশক—সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়		৩
আমাদের কথা		৪
চমস্কি বনাম পাভলভ	প্রবজ্যোতি মজুমদার	৫
ভারতে বধির শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	অনুভূতি বসু	১৫
ন্যায়নীতি মানবতাবাদের সাম্প্রতিক প্রয়োগ	পরিতোষ ভট্টাচার্য	১৮
জ্ঞানবিরোধিতা প্রসঙ্গে	মনোবিদ	২৩
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান সমাজ	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৯
কুতূহলিনী জিজ্ঞাসা	সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩৫
চিঠিপত্র		৩৯
পণ্য (নাটক)	দীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪২
সাময়িকী		৫৭

মানবমন-এর

কার্যনির্বাহক সমিতি

সমর গুপ্ত
সুনীল বিশ্বাস
সবিৎ রায়
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌতম মোদক
কামাখ্যা সেনগুপ্ত
প্রবীর বিশ্বাস
সুব্রতা মুখোপাধ্যায়
পরিতোষ গুপ্ত
উষ্ণি সেনগুপ্ত
শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
নীহার কর্মকার
ঊর্মি গঙ্গোপাধ্যায়
সোমেন গুহ
শ্যামল দত্ত

মানবমন-এর নিয়মাবলী

১। 'মানবমন' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী, এপ্রিল জুলাই, অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য : ২·৫০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য ৩·০০ টাকা। ডাকে প্রতি সংখ্যা ২·৮০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহকমূল্যের ক্ষেত্রে ডাকে ১২·০০ টাকা অগ্রিম দেয়। জানুয়ারী হইতে বর্ষ আরম্ভ।

৩। চেক, ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার ইত্যাদি PAVLOVE INSTITUTE & HOSPITALS এর নামে প্রেরয়।

৪। এজেন্সী বা ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্যাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। কমিশন ২০%।

৫। গ্রাহকদের কাগজ অতিরিক্ত রেজেষ্ট্রী খরচ না দিলে বুক-পোষ্টে পাঠান হয়।

পাভলভ ইন্সটিটিউট
১৩২/১এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
ফোন : ৪৫-৩২২৯

With best compliments from :

Treatment Home Products

36, Creek Row, Calcutta-700 014

Telephone : 265838

ঘোষণা

১। পত্রিকার নাম—মানবমন ২। যে ভাষায় প্রকাশিত হয়—বাংলা

৩। প্রকাশনার কাল—(ত্রৈমাসিক : জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর)

৪। মূল্য—প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা বিশেষ সংখ্যা ৩·০০ টাকা

৫। প্রকাশকের নাম—ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়,
জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৭৩, বিধান সরণী, কলি-৭০০০০৬

৬। প্রকাশনার স্থান—১৩২/১এ, বিধান সরণি, কলিঃ ৭০০০০৪

৭। মুদ্রকের নাম—সোমনাথ মুখোপাধ্যায়,
জাতি—ভারতীয়, ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৪

৮। প্রেসের নাম ও ঠিকানা—মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

৯। সম্পাদকের নাম—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা—১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৪

১০। সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—পাবলিশিং ইনষ্টিটিউট, ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৪

আমি এতদ্বারা বিঘোষিত করিতেছি যে, ১৩২/১এ, বিধান সরণী হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস হইতে মু
'মানবমন' পত্রিকার আমি প্রকাশক ও মুদ্রক এবং উপরোক্ত ঘোষণা আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান অনুযায়ী স

ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যা

মানবমন

জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৮২ বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

সম্পাদকীয়

'মানবমন'-এর মত পত্রিকার পক্ষে বিশ বছর বেঁচে থাকতে হলে যতটা সংগ্রাম করা দরকার আমরা হয়তো ততটা সংগ্রাম করতে পারিনি, তবুও পত্রিকাটি বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলেও 'মানবমন'-এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। জনপ্রিয়তা, যাকে বলে 'পপুলারিটি' বাড়েনি, কলেবর বাড়েনি, গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ-ভাবে বাড়েনি। এ ভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? এ প্রশ্ন অনেকে তুলতে পারেন। আমরাও নিজেদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা করেছি। অনেক সময় ভেবেছি জনসাধারণের মধ্যে যদি প্রচার না বাড়ে, তবে পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? একজন বললেন, তাত্ত্বিক কচকচি বন্ধ করে সরস প্রবন্ধ ছাপান না কেন? মনোবিজ্ঞানের পরিধির আজ বিস্তার ঘটছে; পরামনোবিদ্যা, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারোভয়েন্স নিয়ে দেশ বিদেশে হৈচৈ পড়ে গেছে—কত মজাদার ঘটনার বিবরণ বেরুচ্ছে। সেই সব নিয়ে লিখুন—পপুলারিটি বাড়বে, গ্রাহক বাড়বে। আর একজন বললেন, স্রেফ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংবাদ পরিবেশন করুন—যেমন আর পাঁচটা পত্রিকা করছে। দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সংখ্যা, সাপ্তাহিক পত্রিকার বিজ্ঞানের পাতা—ঐগুলোর ছাঁচে ফেলে চালিয়ে যান; সংগে দু'একটা সায়েন্স ফিকশন্—বাজারে চালু হতে সময় লাগবে না। কিন্তু একজন আবার বললেন, দেখুন, আপনাদের গায়ে, পত্রিকার পাতায় বিশেষ ধরনের যে গন্ধ তার আর বাজার নেই। উনিশ শতকের বস্তাপচা তত্ত্ব এই ই এস পি, সিবারনেটিক্স, স্পেশট্রাভেলের যুগে চলতে পারে না। দেখছেন না, আপনাদের নিজেদের মধ্যেই কত বাদ-বিসম্বাদ, কতরকমের উপদলীয় কলহ, কতরকমের ভাগ্য। আপনারা ধনীয় নিষ্ঠার সংগে আপনাদের বৈজ্ঞানিক দর্শন নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেছিলেন, তাই আপনাদের তত্ত্বও ধর্মশাস্ত্রের মত ক্রমবিভাজনের পথে অবলুপ্তির পথে চলেছে। মানুষ আপনাদের তত্ত্বের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। আপনাদের গায়ের গন্ধ পত্রিকায় যতদিন থাকবে ততদিন পত্রিকা 'সেক্টেরিয়ান' বলে গণ্য হবে; সাধারণ পাঠকের হাতে উঠবে না।

সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আবার বলছি মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক না করলে সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব হবে না; সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সম্ভব হবে না; সাম্যবাদী সমাজের উত্তরণ ঘটবে না। মানুষের শারীরবৃত্তিক বিবর্তন বা আঙ্গিক পরিবর্তন হয়তো আর সম্ভব নয়; কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের কার্যিক পরিণতির ও মানসিক উন্নয়নের আরো প্রচুর সম্ভাবনা আছে; সামাজিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি,

উৎপাদন সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক পুনর্গঠন, নতুন নতুন যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষণের ক্রমবিকাশের ফলে মানবমস্তিষ্কের আরো বহুকোষ সক্রিয় হবে, আরো নতুন নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হবে মানব প্রজাতি। সাম্য সমাজ গঠন ও তার পোষণ বিবর্ধনের জন্য যে সব বিজ্ঞান-কর্মীর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় জনসমাজে নতুনতর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটবে তাদের কাছে 'মানবমন' পত্রিকা চিরকালই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ও দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতির জন্য অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। আমরা জনপ্রিয়তা ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধিকে (যা এই সমাজ ব্যবস্থায় স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ঘটাই সম্ভব) চিরদিনই অধিক গুরুত্ব দেব। ভাববাদ ও অন্ধবাদপুষ্ট অকল্যাণকর ধ্যানধারণা এবং অধিবিদ্যা পরামনোবিদ্যার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যার প্রচার ও প্রসার আমাদের লক্ষ্য।

৮ ৩.৮২

আমাদের কথা

এই সংখ্যায় দুটি লেখা মূল ইংরাজি থেকে ভাষান্তরিত করেছেন শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস। তাঁর নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়নি, তাই এইখানে সংবাদটি জানানো হল। একটির লেখক শ্রীপরিত্রেষ ভট্টাচার্য [illegible] সোভিয়েত বার্তাবিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট। অন্যটির লেখক মনোবিদ্।

'কুলকুণ্ডলিনী' বিষয়ক নিবন্ধটি লিখেছেন ডাঃ সুবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। আশা করি পাঠকদের কিছু অংশ এই বিষয়ে বস্তুবাদসম্মত অভিমত প্রকাশ করতে আগ্রহী হবেন। কোনো অধিবিদ্যামূলক আলোচনা বা ব্যাখ্যায় 'মানবমন' পত্রিকায় কোনো আগ্রহ নেই।

'চমস্কী ও পাভলভ' সম্পর্কে লিখেছেন সহ-সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার। ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণতত্ত্ব (বিজ্ঞানের আরো অনেক শাখা) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা পাভলভীয় মনোবিদ্যার আলোকে অনেক বেশি বোধগম্য হবে—এই বিশ্বাস আমরা রাখি। আজকের অন্যান্য অনেক জটিল সমস্যা সমাধানে পাভলভীয় মনোবিদ্যার সাহায্যে প্রয়োজন—আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সংগে সংগে উপলব্ধি করছি। যাঁরা পাভলভ নিয়ে চর্চা বা গবেষণা করছেন সকলের কাছে আমাদের নিবেদন তাঁরা যেন নিজেদের অভিজ্ঞতা, ধারণা ও গবেষনার বিষয়বস্তু ও ফলাফল আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্য পাঠিয়ে আমাদের ও পাঠকদের উপকৃত করেন।

গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, নিজেদের বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা পাঠিয়ে ও অন্তত একজন নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করে পত্রিকার আয়ু বর্ধনে সাহায্য করুন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

চমস্কি বনাম পাভলভ

ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার

॥ ১ ॥

সমসাময়িক যুগে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আব্রাম নোয়াম চমস্কি অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক পরিধিতে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব থেকে মনোবিদ্যার মাধ্যমে তিনি যেভাবে দর্শনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন—সে ব্যাপারটি মনে হয়, অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বিশেষত শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, নতুন আবরণে মানুষের "মন" সম্পর্কে দ্বৈতবাদী (dualistic) প্রত্যয়কে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে বলেই আমার ধারণা। এবং আপত্তি মূলত সেখানেই। অথচ লক্ষ্য করেছি—চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে যাঁরা বস্তুবাদী (materialist) বলে পরিচিত তাঁরা অনেকেই এ ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা প্রকাশ করেন নি। বস্তুত, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চমস্কির এসটাবলিশমেন্ট বিরোধী সুরধার বক্তব্য অনেক প্রগতিশীল মানুষকেই মুগ্ধ করেছে। এবং সেই মুগ্ধতার অবকাশে চমস্কির ভাববাদ প্রবণতা তাঁদের প্রভাবিত করেছে—বেশ ভালোভাবে। অথচ রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের জগতেও দেশিকোত্তম নোয়াম চমস্কি সুস্পষ্টভাবেই মার্কসের বিরুদ্ধে বাকুনিনকে নতুন করে পাদপ্রদীপে আনার চেষ্টা করেছেন—সাম্যবাদী সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী সাময়িক আপসাতের সমাজবিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যার পথে না গিয়ে তিনি মার্কসবাদী রাষ্ট্রচিন্তার বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) ধ্যানধারণাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস: তাঁর ভাষাতত্ত্ব, ভাষা মনোবিদ্যা, মনোদর্শন (rational psychology) এবং নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। এবং সেই সূত্র আবশ্যিকভাবেই ভাববাদী (idealistic) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থাৎ স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল। সেজন্যেই প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার অগ্রগতির স্বার্থে চমস্কির সমগ্র মতাদর্শের বিরুদ্ধে সুসংঘবদ্ধ অভিযান পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এবং সে কাজটি শুরু করতে হবে—ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (rationalist) বাগবিস্তারকে খণ্ডন করার একমাত্র হাতিয়ার হল মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ পাভলভীয় শারীরবিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যা। সোজা কথায়—চমস্কির ভাষা-মনস্তাত্ত্বিক আপ্তবাক্যকে সরাসরি পাভলভীয় বিশ্লেষণের মুখোমুখি হাজির করা দরকার। কারণ পাভলভকে বাদ দিয়ে যথার্থ বস্তুবাদী মনোবিদ্যা এবং সার্থক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সম্ভব নয়। এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছাড়া চমস্কির প্রচ্ছন্ন ভাববাদের মোকাবিলা করার —অন্য পন্থা।

—২

॥ ২ ॥

অবশ্য একটি প্রবন্ধের গণ্ডীতে পূর্ণ সমালোচনাসহ চমস্কির সমগ্র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশদভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে ভাষা বিজ্ঞানের প্রতি চমস্কীয় ভিত্তিমূল থেকে "চমস্কীয় বিপ্লবের" পুংখানুপুংখ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম[১]। সেখানে সীমায়িত পর্যায়ভিত্তিক ব্যাকরণ (Finite State Grammar) এবং বাক্যাংশিক গঠনভিত্তিক ব্যাকরণ (Phrase Structure Grammar) সংক্রান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ (Transformational Grammar) সম্পর্কে চমস্কীয় প্রত্যয়ের বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি—বাংলাভাষার চমস্কির ব্যাকরণগত উদাহরণগুলিকে রূপায়িত করার বিনীত প্রচেষ্টার সাহায্যে।

সেই বিশ্লেষণে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে—চমস্কি তাঁর 'ভাষাতাত্ত্বিক বিপ্লবের' ফলশ্রুতি হিসাবেই মানুষের 'মন' এবং তার ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তিবাগ্রাহ্যবাদী (অর্থাৎ মূলত মনোবাদী) বক্তব্য পেশ করেছেন—যান্ত্রিক বস্তুবাদী, অর্থাৎ শারীরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক, দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো মেনে নেওয়া যায় না। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ (Empiricism)-এর বিরুদ্ধে, এবং তারই একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারা হিসেবে আচরণবাদ (behaviourism) এর বিরুদ্ধেও, আমাদের অনেক কিছুই বলার আছে। আর সে বক্তব্য—বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দর্শন এবং শারীরবিদ্যা-সমাজবিদ্যা ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু চমস্কি ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ তথা আচরণবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ভাববাদের গহ্বরেই গিয়ে পড়েছেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করা উচিত যে, আচরণবাদের আধুনিক প্রবক্তা স্কিনার এবং ভাষা-মনস্তাত্ত্বিক চমস্কি—এঁরা উভয়েই ভাষা শিক্ষা সম্পর্কীয় প্যাভলভীয় বিশ্লেষণকে সযত্নে পরিহার করেছেন। সমস্যা আসলেই সেখানে।[২]

॥ ৩ ॥

যে বছর (1957) চমস্কির "সিনট্যাকটিক স্ট্রাকচার্স" নামক বইটি বেরিয়েছিল, সে বছরই প্রকাশিত হয়েছিল বি. এফ. স্কিনারের "ভার্বাল বিহেভিয়ার" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই বইটিতে স্কিনার তাঁর বিশুদ্ধ আচরণবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া সম্বেলনমূলক দৃষ্টিকোণ) থেকে মানুষের ভাষাগত আচরণ, বিশেষত শিশুর ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এই মার্কিন মনোবিদ মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রের জটিল সংশ্লেষণী কার্যকলাপের যান্ত্রিক ভূমিকাকে কোনো গুরুত্বই দেন নি ; প্রাণী যেন তাঁর কাছে শূন্যগর্ভ একটি যান্ত্রিক কাঠামো। মানুষের ক্ষেত্রেও উচ্চতর স্নায়বিক কার্যকলাপের এবং সামাজিক জীবনের 'ঘাত-প্রতিঘাতে'র মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাস্তব চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা—এই সমস্ত আচরণবাদীর কাছে মনোবাদী

---

১. "ভাষাতত্ত্ব থেকে মনোদর্শন", মানব-মন, বিশেষ অক্টোবর সংখ্যা (1976), পৃ. ২০১-২২৪।

২. আধুনিক যুগে সার্ত্রে-এর মতো যাঁরা যান্ত্রিক চিন্তাকে খণ্ডিত করে মার্কসবাদকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন—তাঁরাও কিন্তু সবাই প্যাভলভকে অস্বীকার করতে চান !

(mentalistic) প্রমাণ যায়। 1971 সালে প্রকাশিত "বিজয় স্টীভন অ্যাণ্ড হিসনিট" গ্রন্থেও স্কিনার জানেন না—চামড়ার নীচে কী ঘটছে। স্বভাবতই সমগ্র ভাষা শিক্ষা ব্যাপারটি স্কিনারের কাছে নিছক স্বয়ংক্রিয় (operant conditioning) প্রক্রিয়ার প্রকাশ মাত্র।

1959 সালে ল্যাংগুয়েজ পত্রিকায় চমস্কি স্কিনারের উপরোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে আচরণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য পেশ করলেন। স্কিনারীয় উদ্দীপক প্রতিক্রিয়াভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিকে তিনি আঘাত করলেন 'অবগতিমূলক মনোবিদ্যা' (cognitive psychology)-র দৃষ্টিকোণ থেকে। বস্তুত, স্কিনারের সমালোচনা করতে গিয়ে চমস্কি শুধু আচরণ-বাদকেই আক্রমণ করেন নি। তাঁর বিদ্রোহ—ভাষাগত আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়োপাত্ত-বাদী (empirical) ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে; সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতাবাদী (experiential) তথ্য প্রমাণের বিরুদ্ধে। এবং এখানেই তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে মনোবাদী দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। স্কিনারের সমালোচনা করতে গিয়েই চমস্কি বলেছেন: ভাষাগত আচরণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদী বিশ্লেষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ, এই জাতীয় বিশ্লেষণে ভাষার 'উচ্চারিত বাহ্যিক অবয়বের' ব্যাখ্যাই শুধু করা হয়। অথচ—ভাষার বেশীরভাগ নিয়মিততা (regularity) একমাত্র তখনই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যখন "মাথার (!) মধ্যে অবস্থিত জটিল কতকগুলি শব্দবিন্যাস-বিশ্লেষক" (complex syntax analyser in our heads)-এর সাহায্যে ভাষার ব্যাকরণগত 'নিহিত-গঠন' (deep-structure) ছেঁকে বের করে আনা হয়। চমস্কি এখানে বাক্যের নিহিত গঠনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—ব্যাকরণগত বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত যৌক্তিক প্রতিজ্ঞা বা logical proposition-এর। এবং আপাতদৃষ্টিতে, এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য খানিকটা শারীরবৃত্তীয় বলে মনে হয়।

এই সমালোচনা সূত্রেই চমস্কি—বক্তা এবং শ্রোতা হিসেবে ভাষা-ব্যবহারকারীর ভাষাগত স্বজ্ঞা বা linguistic intuition-এর প্রত্যয়কে আরও স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। এবং শারীরবিজ্ঞান-মূলক পরিভাষার কিছু কিছু ব্যবহার সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে, মূলত এখান থেকেই শুরু হয়েছে যুক্তিবাতন্ত্র্যবাদ (rationalism)-এর দিকে চমস্কির স্পষ্টতর উৎক্রান্তি (transition)। কারণ, তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারধর্ম হল এইরকম: ভাষা ব্যবহারকারী যদি নিজের অজান্তেই ভাষার অন্তর্নিহিত গঠন সম্পর্কে একটা সুসংবদ্ধ ব্যাকরণগত 'তত্ত্ব' (theory)-এর অধিকারী না হত, [অর্থাৎ ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে তার 'মনে' যদি একটা মোটামুটি বিষয় ও কার্যকরী কাঠামো (scheme) তৈরি-অবস্থায় আগে থেকেই অস্তিত্বশীল না থাকত], তাহলে তার পক্ষে ভাষার বাহ্যিক গঠন (surface-structure)-এর মাঝেমধ্যে সমতা (equivalence) নিয়মিততা (regularity) দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) প্রভৃতি ব্যাপারের বিভিন্ন উদাহরণ—শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা বা চিন্তাভাবনা না করেই নিত্য-নূতন ক্ষেত্রে (মোটামুটি) সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হত না।... পরবর্তী পর্যায়ে এই বক্তব্যকেই চমস্কি যেভাবে বিস্তারিত করেছেন তাতে তাঁর চিন্তাধারায় যুক্তিবাতন্ত্র্য-বাদী প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে: ভাষার ব্যবহৃত বাক্যগুলির নিহিত গঠন সম্পর্কে ভাষা ব্যবহার কারীর কতকগুলি 'অন্তর্নিহিত ধারণা' (innate ideas?) এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার

করার একটি 'প্রাক-প্রবৃত্তি'ই হল তার ভাষা ব্যবহারগত মৌলদক্ষতা; আর একমাত্র এই মৌল দক্ষতার প্রকল্পের ভিত্তিতেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে "সৃজনশীলতা নামক" লক্ষণটির সমাক "ব্যাখ্যা দেওয়া" সম্ভব।

॥ ৪ ॥

এইভাবেই চমস্কি ভাষা-মনোবিজ্ঞার রাজ্য থেকে ক্রমশ পা বাড়িয়েছেন—মুক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোদর্শনের দিকে। 1965 সালে প্রকাশিত "এ্যাসপেক্টস অব্ দি থিওরি অব সিনট্যাক্স্", 1966 সালে প্রকাশিত "কার্টেসিয়ান লিংগুইস্টিক্স্", 1968 সালে প্রকাশিত (এবং 1972 সালে বর্ধিত সংস্করণ হিসাবে পুনর্মুদ্রিত) "ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড মাইণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থে চমস্কি ক্রমশ বেশি করেই ঘোষণা করেছেন যে, ভাষাবিজ্ঞান অবশ্যই মূলক মনোবিজ্ঞার একটি শাখা। এই সমস্ত রচনাতেই তিনি—শুধুমাত্র ভাষাগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নয়, উপরন্তু 'মানবমনের গঠন' এবং ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তার 'প্রাক-প্রবৃত্তি' (predisposition) সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যাপারেও—তাঁর উৎপাদনধর্মী (generative) ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করেছেন। 'রূপান্তরমূলক উৎপাদনধর্মী ব্যাকরণ'কে যে কোনো মাতৃভাষা ব্যবহারকারী মানুষদের 'ভাষাব্যবহারের মৌলক্ষমতা'র একটি বিমূর্ত বর্ণনা (idealized description) বলে স্বীকার করে নিয়ে তিনি এই প্রস্তাবনা উপস্থিত করেছেন যে, এই জাতীয় ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের সাহায্যেই মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

বিশেষত "ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড মাইণ্ড" গ্রন্থেই চমস্কি ভাষাগত আচরণ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মানুষের মনের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানেও তিনি ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদী ব্যাখ্যার 'অসার্থকতা' ঘোষণা করে বলেছেন: ভাষাকে মোটামুটি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে গেলেও এমন কিছু জটিল এবং বিমূর্ত (abstract) নিয়মকানুন জানতে হয়, যেগুলি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা সম্ভব নয়। তিনি দাবী করেছেন: ভাষাগত দক্ষতার আধুনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মানুষ—বিভিন্ন ভাষাগত প্রকাশের ব্যাকরণ-সংগতি, দুটি ভিন্ন প্রকাশের একার্থবোধকতা, একই বাক্যের দ্ব্যর্থবোধকতা প্রভৃতি—'স্বাভাবিকভাবেই' উপলব্ধি করে। এইভাবে, সাধারণ মানুষেরা ব্যাকরণ-শিক্ষা 'না পেলেও' যে সমস্ত ব্যাকরণগত নিয়মকানুন সম্পর্কে 'অন্তর্নিহিত' জ্ঞানের পরিচয় দেয় সেগুলি যথেষ্ট জটিল এবং বিমূর্ত। এই দাবীর ভিত্তিতেই চমস্কি অত্যন্ত ব্যাপক এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন: প্রচলিত কোনো "অনুষঙ্গমূলক শিক্ষাতত্ত্ব" (associative theories of learning)-এর সাহায্যেই এ জাতীয় অনায়াস ব্যাকরণ শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বিশেষত, সমস্ত দেশের শিশুরাই বিশ্বের একটি বয়সে মোটামুটিভাবে একই রকম ভাষাগত মৌল দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদের সামনে শিশুদের এই জাতীয় ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটি সবচেয়ে বড়ো একটি সমস্যা। কারণ (চমস্কির মতে), প্রাপ্তবয়স্করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সচেতনভাবে শিশুদের ব্যাকরণসম্মত ভাষা ব্যবহার করতে শেখান না; বরং শিশুর প্রাথমিক দুই-শব্দ-বিশিষ্ট অর্থ-বাক্যেই তাঁরা শক্তিসঞ্চার (reinforcement) করে থাকেন।

সুতরাং, সমস্যা হল—এই 'এলোমেলো' ভাষাগত পরিস্থিতিতেও শিশুরা কি করে মাতৃভাষার মূল ব্যাকরণগত কাঠামোটি মোটামুটি সঠিকভাবেই আয়ত্ত করতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই চমস্কি কতকগুলি 'ভাষাগত সামান্য' (linguistic universal), অর্থাৎ সমস্ত ভাষার অন্তরঙ্গের কিছু-সংখ্যক সর্বজনীন বিষয়ের কথা বলেছেন। ভাষাগত সামান্যের প্রত্যয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দাবী করেছেন যে, কতকগুলি ভাষাধ্বনিগত (phonological) শব্দবিন্যাসগত (syntactic) এবং অর্থনির্ধারণগত (semantic) একক unit-কে কোনো বিশেষ ভাষার ব্যবহৃত হওয়া-না-হওয়ার প্রশ্ন থেকে স্বাধীনভাবে (অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে) বর্ণনা করা যায়। এই এককগুলি একটি 'সামগ্রিক ভাষাগত তত্ত্বের অধীভূত এবং সেই তত্ত্বের অধীনেই তাদের সংজ্ঞার্থ (definition) নির্ণয় করা সম্ভব।

ভাষাধ্বনিগত, শব্দবিন্যাসগত এবং অর্থনির্ধারক সামান্যগুলিকে চমস্কি 'বস্তুগত সামান্য' substantive universal, আখ্যা দিয়েছেন। তবে এই বস্তুগত সামান্যগুলির চেয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন 'আকারগত সামান্যগুলির' ওপর। এগুলি হল এমন কতকগুলি সাধারণ নীতি, যারা সমস্ত ভাষার ব্যাকরণগত নিয়মকানুনের আকৃতি এবং তাদের প্রয়োগ (operation) নিয়ন্ত্রণ করে।

এইসব ভাষাগত সামান্য থেকে পাওয়া সার্বিক প্রত্যয়, নীতি এবং সূত্রের সমষ্টিই হল চমস্কির "সর্বজনীন ব্যাকরণ" (universal grammar)। তাঁর মতে—এই সর্বজনীন ব্যাকরণের ধারণা দিয়েই মানুষের সমস্ত ভাষাগত আচরণ ব্যাখ্যা করা যাবে ; বিশেষত শিশুদের ভাষাশিক্ষার সমস্ত সমস্যারই সমাধান মিলবে এই ব্যাকরণের প্রত্যয় (concept)-কে গ্রহণ করলে। চমস্কির দাবী অনুসারে এই সর্বজনীন ব্যাকরণ সমস্তদায়ন শিশুর 'আত্তর সম্পদ (innate endowment) : অর্থাৎ, শিশু এই সম্পদ নিয়েই জন্মায়। এরই দৌলতে সে পরিবেশের ভাষা আপনা থেকেই বুঝতে পারে এবং বলতে পারে ; বিভিন্ন পর্যায়ের নানা অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অনায়াসে প্রাতিবেশিক (environmental) ভাষার মৌলিক ব্যাকরণগত নিয়মকানুন মোটামুটিভাবে শিখে ফেলতে পারে। চমস্কির ভাষায়—আত্তর-সম্পদরূপে এই সর্বজনীন ব্যাকরণ ভাষাশিক্ষা এবং ভাষা ব্যবহারের প্রতিটি ধাপেই একটি ব্যাখ্যামূলক কাঠামো (interpretation scheme) হিসেবে কাজ করে, যে কোনো ভাষাই সর্বজনীন এই কাঠামোর মধ্যে খাপ খেয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

দর্শন এবং মনোবিদ্যার ইতিহাসে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কোনো ধারণার অবতারণা করে কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ব্যাকরণগত বর্ণনা দিয়ে চমস্কির বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করলে—তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অবশ্য ইতিমধ্যে চমস্কির নিজের শিবিরেই যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এবং ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে চমস্কীয় ভাষা-মনোবিদ্যা (psycholinguistics)-এর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'স্নায়বিক-কার্যকলাপভিত্তিক-ভাষাবিদ্যা' (neurolinguistics) এবং 'সমাজভিত্তিক ভাষাবিদ্যা' (sociolinguistics) নামক দুটি ভাবধারা সমসাময়িক পর্যায়ে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে, মূলত অনুক্ত হলেও—মার্কস-

এঙ্গেলস, ডারউইন এবং পাভলভের সুস্পষ্ট প্রভাব অনস্বীকার্য।

বস্তুত, মানুষের ভাষাগত আচরণের সার্থক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করতে হলে প্রাণিবিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান, নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতির প্রমাণিত সিদ্ধান্তগুলিকে সমন্বিত ভাবে চেষ্টাই করতে হবে। এই পন্থায় ভাষার সৃজনশীলতা ও বিভিন্ন ভাষার ভেতরকার সর্বজনীন ব্যাপারগুলির সম্যক ব্যাখ্যা অবশ্যই দেওয়া যাবে। এবং এই পথেই মানবিক চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণও সম্ভব। চমস্কি মূলত ভাববাদের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থেকে নিছক ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ এবং তৎসহ গাণিতিক-যুক্তিবিদ্যার নিপুণ ব্যবহারের সাহায্যেই ভাষাশিক্ষার রহস্য এবং মানব-মনের স্বরূপ জানার যে চেষ্টা করে চলেছেন—তা থেকে অসার্থক অধিবিদ্যাগত (metaphysical) জঞ্জাল জমানো ছাড়া আর কিছুই করা যাবে বলে মনে হয় না।

কারণ, চমস্কি শিশুর ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেরকম ঢালাওভাবে সমস্ত অনুষঙ্গমূলক শিক্ষাতত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছেন, এবং ভাষাশিক্ষাকে অন্যান্য ধরনের শিক্ষা থেকে যেভাবে পৃথক করতে চেয়েছেন—তাতে তাঁর বক্তব্যের বিজ্ঞানধর্মিতা সম্পর্কেই সংশয় সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কারণ, অনুষঙ্গমূলক (associative) শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্কিনার প্রভৃতির 'বিশুদ্ধ আচরণবাদ'ই শেষ কথা নয়। লক-প্রভাবিত মূলত ভাববাদী বিশ্লেষণ এবং আচরণবাদ স্থূলত বাহ্যিক ব্যাখ্যার মধ্যেই অনুষঙ্গবাদকে সীমাবদ্ধ বলে মনে না করলে, একথা নিশ্চয়ই দাবী করা যায় যে—পাভলভীয় শারীরবিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের শিক্ষাতত্ত্বও মূলত অনুষঙ্গমূলক। পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে, "শিশু কী করে ভাষা শেখে ?"—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশদ বক্তব্য রেখেছিলাম। সেখানে শিশুর 'জন্মগত সম্পদ' (genetic endowment)-এর কথা বলেছি। আবার পরিবেশের প্রভাবে 'আরোপন' (conditioning)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও স্বীকার করেছি। বিশেষত, এটা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, পাভলভ প্রমাণিত 'প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র' এবং 'দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের' সম্পর্ক এবং পার্থক্য অনুধাবন না করলে ভাষা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ধোঁয়াটে হয়েই থাকবে। আমি মনে করি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ভাষার 'সৃজনশীলতা'র ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে গুরুত্বচিহ্নের, প্রধানত অনুষঙ্গ এলাকার, জটিল বিশ্লেষণী এবং সংশ্লেষণী কার্যকলাপের ভিত্তিতে 'চেতনা' এবং 'অবগতি'র বাস্তব ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। তার জন্যে মনোদার্শনিক অ্যাভভেঞ্চার নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে সেই কথাগুলিই সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে চাইছি। এবং তারই মাধ্যমে শিশুর ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে চমস্কীয় চিন্তা এবং পাভলভীয় বিশ্লেষণের তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করতে চেষ্টা করছি।

॥ ২ ॥

শিশুর ভাষাশিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চলেছে। প্রাথমিক পর্যায়ের 'জীবনীগত পদ্ধতি (biographical method)-এর সঙ্গে আধুনিককালে যুক্ত হয়েছে উন্নততর তুলনা-

মূলক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি। বেলি, বুলের, শার্লি, টম্পসন, ক্যাটেল, পিয়াজে প্রভৃতি শিশু মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা রচিত বিষয়ণপঞ্জীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে মানব শিশুর ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন মৌল পর্যায় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত মনোবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিছক ভাষাগত আচরণভিত্তিক তথ্যপঞ্জী রচনা এবং শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে বিভিন্ন তত্ত্ব-সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে 'পরমাণুধর্মী' (atomistic) বলে সমালোচনা করেছেন। কে. গোল্ডস্টাইন প্রভৃতি গবেষক তার বদলে 'সমগ্রদৈহিক' (organismic) পদ্ধতি অনুসরণ করে—শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ধারার সঙ্গে মিলিয়ে তার ভাষাগত আচরণের অভিব্যক্তি (evolution)-কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত, "শিশু কী করে ভাষা শেখে ?"—এই প্রশ্নের সার্থক উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রথমে তার সংবেদনী এবং চেষ্টীয় বিকাশের (sensory এবং motor development-এর) ধারাকেই অনুসরণ করতে হবে। তার জন্যে—তার গোটা স্নায়ুতন্ত্রের, বিশেষত তার গুরুমস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের খোঁজ খবরও নিতে হবে। কারণ, একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে—হাজার চেষ্টা করলেও অন্যান্য প্রাণীদের (এমনকি শিম্পাঞ্জীর মতো উন্নততর প্রাণীদেরও) সত্যি করে মানুষের ভাষা শেখানো যায় না। অথচ সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানব-শিশু অবলীলাক্রমে সে ভাষা শিখে ফেলে—মোটামুটি পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই। এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্যে 'পীনিয়্যাল গ্রন্থিতে বসবাসকারী' (!) তিনশো বছরের বৃদ্ধা পচা কার্তেসীয় আত্মিক-সত্তার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞানের সম্মিলিত সাধনা এরূপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে—মানবশিশুর ভাষাশিক্ষা ক্ষমতার শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি (physiological basis) হল তার কতকগুলো বাস্তব জন্মগত সম্পদ' (genetic endowment); আর তার পেছনে আছে জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় মানবজাতির হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশ। এই মূল ভিত্তির ওপর ভাষার উপসৌধ (superstructure) রচনার জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন—প্রবহমান সামাজিক পরিবেশের অস্তিত্ব।

শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে, মানুষের ভাষাগত আচরণের মূলে আছে দুটি ব্যাপার : একটি হল অন্যান্য প্রাণীদের থেকে অনেক উন্নত বাকযন্ত্রসমূহ (organs of speech)-এর সম্মিলিত ভূমিকা, এবং আর একটি হল তার গুরুমস্তিষ্কের (বিশেষত গুরুমস্তিষ্ক বল্কলের) উন্নততর গঠন ও কার্যকলাপ।

বিশদ বিশ্লেষণে না গিয়ে এখানে শুধু একথাই পুনরাবৃত্তি করছি যে—সমগ্র বাকতন্ত্রের (বাকযন্ত্র-সমূহের) বিচিত্র কর্মক্ষমতার দৌলতেই প্রকৃত ধ্বনিসত্তার মানুষের বিভিন্ন ভাষার শুনতে পাওয়া যায়। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীই এতো বেশি সংখ্যক মৌলধ্বনি (phoneme) উচ্চারণ করতে পারে না। এবং এই গোটা ব্যাপারটাই মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায়, আর (হাতের গঠনের বিশিষ্টতার ক্রমিক ফলশ্রুতি হিসেবে) ক্রমশ জটিল শ্রমের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। আজকের মানবশিশু বিগত হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন মানবীয় বাকতন্ত্রের উত্তরাধিকারী। 'বংশানু-সংকেত' (gene-code)-এর "নির্দেশে"—মাতৃগর্ভে তাকে যেমন লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক অভিব্যক্তির ধারা পার হয়ে আসতে হয়, তেমনি ভাষাগত আচরণের ধ্বনি-সংক্রান্ত দিকটির ক্ষেত্রে তাকে বছর পাঁচেকের মধ্যেই মানবীয় বাক্-তান্ত্রিক ক্রমবিকাশের হাজার হাজার বছর পাড়ি দিতে হয়। তারপরেও

ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক এলাকার বিশেষ বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আলাদা আলাদা ভাষার বিভিন্ন সাংগঠনিক (syntactic) এবং অর্থসংক্রান্ত (semantic) ধারার আয়ত্ত পেতে পেতে তার কেটে যায় আরও দু-চার বছর।...

কিন্তু শুধু বাকতন্ত্রের উন্নততর গঠন এবং বিচিত্র কর্মক্ষমতা গড়ে উঠলেই মানুষের পক্ষে সুস্পষ্ট এবং সুশৃঙ্খল ভাষার ব্যবহার সম্ভব হত না। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল তার গুরুমস্তিষ্কের, বিশেষত গুরুমস্তিষ্ক বল্কল (cerebral cortex)-এর জটিলতা এবং কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 'গুরুতর' অগ্রগতি। সুতরাং ভাষাগত আচরণের মৌল শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি হিসেবে শিশুর পক্ষে শুধু মানবীয় বাকতন্ত্রের মালিকানা পেলেই চলে না। সেই বাকতন্ত্রকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে তার গুরুমস্তিষ্কের বাক্‌চেষ্টীয় কেন্দ্র (motor-speech centre)-টিরও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা চাই।

অবশ্য, জন্মসূত্রে মানবশিশু তার বাকতন্ত্রের এবং গুরুমস্তিষ্কের চেষ্টীয় (motor) নিয়ন্ত্রণের উত্তরাধিকারী হলেই সে যথার্থ ভাষা ব্যবহার শিখতে পারে না। কারণ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে একটি অর্থগত দিক; এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সেই অর্থের ব্যাপারটির মূলে রয়েছে পাভলভ-আবিষ্কৃত 'দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর' (second signalling system)। 'প্রথম সংকেত ব্যবস্থা'র মাধ্যমে অন্যান্য প্রাণীদের মতো মানুষও সংবেদন প্রত্যক্ষণের মধ্যে দিয়ে বাস্তব জগৎকে জানতে এবং চিনতে পেরেছে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবনে যৌথশ্রমের প্রয়োজনে পরস্পরের কাছে নিজের নিজের জ্ঞান ইচ্ছা পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষ যখনই বস্তু ঘটনা ইত্যাদিকে বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করেছে, তখনই উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের। অর্থাৎ এরা হল 'সংকেতের সংকেত'।

বস্তুত দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর হল সমাজবদ্ধ খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণী হিসেবে একান্তভাবেই মানুষের নিজস্ব সম্পদ। শিশু এই সম্পদের উত্তরাধিকারী বলেই সে ভাষা শিখতে পারে: অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া সংবেদনগুলোর ভিত্তিতে, (বিভিন্ন শর্তহীন পরাবর্তশৃঙ্খলের সাহায্যে সংবেদনী কেন্দ্র সমূহের নানা পরিবর্তন এবং যোগাযোগের ফলে) যে সমস্ত "প্রতিরূপ" [image] গড়ে ওঠে—শর্তাধীন পরাবর্তশৃঙ্খলের জেরের দিয়ে তাদের সঙ্গে শ্রবণগত প্রতিরূপগুলোর স্নায়বিক সংযোগ স্থাপিত হয়। এবং এই অনুষঙ্গের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে 'শাব্দিক প্রতিরূপ' (verbal image)। এই শাব্দিক প্রতিরূপই হল ভাষার অর্থসংক্রান্ত দিকটির মূল্য উপাদান। [বিশদ স্নায়ীয়-বিজ্ঞানসংক্রান্ত বর্ণনায় না গিয়ে এখানে শুধু এটুকুই বলে রাখছি: একদিকে গুরুমস্তিষ্ক বল্কলের বাক্‌চেষ্টীয় কেন্দ্র বা 'ব্রোকার এলাকা' এবং আর একদিকে শ্রবণকেন্দ্রের শ্রৌত্র এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভাষাবোধের অধিষ্ঠান স্বরূপ জেরনিকের এলাকার মধ্যে সংযোগ সাধন করে—ভাষা ব্যবহারের চূড়ান্ত পরিচালক হিসেবে 'ঔলসনের' এলাকা।]

অর্থাৎ, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শর্তহীন (unconditioned) এবং শর্তাধীন (conditioned)—এই দু রকম পরাবর্তশৃঙ্খলেরই প্রয়োজন। বাকতন্ত্র এবং গুরুমস্তিষ্কের বাক্‌চেষ্টীয় কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে শিশু গুরুমস্তিষ্কের উপরোক্ত অন্য দুটি বাক্‌কেন্দ্রেরও উত্তরাধিকারী। তাই অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে মানুষের

ভাষা শেখা সম্ভব না হলেও, সুস্থ এবং স্বাভাবিক শিশু সহজাত শারীরবৃত্তীয় ক্ষমতার জোরে স্বভাবতই ভাষা শিখতে পারে। অবশ্য বাকি কাজটা নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের ওপর। তাই, শিশু যে দেশে যে সমাজে বড়ো হয়ে ওঠে, সেখানকার ভাষাই সে শিখে ফেলে।

[৭]

জীববিজ্ঞান শারীরবিজ্ঞান নৃতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই, দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ বস্তুবাদের, দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যাঁদের নেই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয়—তাঁরা চমস্কির বিশুদ্ধ ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যান। তারপরেই প্রশ্ন তোলেন : শারীরবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনায় ভাষার সৃজনশীলতার এবং সমস্ত ভাষার ভেতরকার কতকগুলো সর্বজনীন নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা কি করে পাওয়া যাবে? কার্তেসীয় আত্মা না হলেও, অন্তত লকীয় (Lockean) 'মন'-এর একটুখানি ছোঁয়াচ না থাকলে—এ ব্যাপার দুটির নিছক শারীরবৃত্তীয় এবং সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এঁদের মনঃপূত হয় না।

কিন্তু 'মন' সম্বন্ধে কোনো অধ্যাত্মবাদী বা আধা-অধ্যাত্মবাদী সংস্কার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে না থাকলে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধারই হওয়ার কথা নয়।

সংক্ষেপে বলছি : সমস্ত ভাষার ভেতরকার সর্বজনীন ব্যাকরণগত শৃঙ্খলার ভিত্তি—সব মানুষের সাধারণ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ এবং সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মোটামুটিভাবে একই ধরণের প্রাথমিক বিকাশ। মানবপ্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে একজনিতত্ত্ব (theory of monogenesis) মানলে ভাষার প্রাথমিক বিকাশের পর্যায়ে গড়ে-ওঠা ব্যাকরণগত নিয়মকানুনের সাদৃশ্য আদৌ রহস্যময় বলে মনে হবে না। উপরন্তু দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের বিস্তরণের মাধ্যমে বাস্তব জগৎকে ধ্বনি সমন্বয়ের সাহায্যে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে—সমস্ত মানুষের একই রকম শক্তি ও সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটি খেয়াল রাখলে 'সার্বিক' ব্যাকরণের উৎস হিসেবে কোনো 'আন্তর-ধারণা সমুচ্চয়ে'র বা 'অন্তর্নিহিত ব্যাকরণগত কাঠামো'র প্রকল্প খাড়া করতে হবে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যে কোনো ভাষায় সরলতম বাক্য প্রকাশ করতে হলেও উদ্দেশ্যবিধেয়র কাঠামো অপরিহার্য। কারণ, বাস্তব জগতের গতিশীল কোনো অবস্থাকে স্থাণু একটা কাঠামোয় বাঁধতে গেলে, কিংবা দ্বিতীয়িক 'দ্রব্য-গুণ সমাবেশ'-কে বিস্তারিত করতে হলে—উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের 'বিচ্ছিন্নতা' কিংবা বিশেষ্য বিশেষণের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। একটি বাঘ যখন বনের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন বাঘটি এবং তার চলমানতার মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই ; সেটা একটা গোটা ব্যাপার। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়েই বিচ্ছিন্নতা চলে আসছে : একটি বাঘ যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বিধেয়র আকারে না বলে বিশেষণ বিশেষ্যের সম্মেলনে প্রকাশ করলেও বিভিন্ন ধ্বনি ভিত্তিক শব্দগত বিচ্ছিন্নতা থাকবেই ; যেমন—চলমান বাঘ। এইভাবে বিশদ বিশ্লেষণ করে করে দেখানো যায় যে, সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের 'সামান্য' (universal) নিয়মগুলির মৌল ভিত্তি নিতান্তই বাস্তব, বিকাশের সমতা এবং সাদৃশ্য।

বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে চমস্কি যে সৃজনশীল উৎপাদন ধর্মিতার কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও

পাভলভীয় অনুবন্ধ-ধর্মী শিক্ষাতত্ত্বের সাহায্যেই দেওয়া যায়। তার জন্যেও কোনো রহস্যময় মানস-সত্তা এবং তার একান্ত সম্পদ হিসেবে কোনো অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori) অন্তর্নিহিত কাঠামো কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। শুধু যন্ত্রিক নিছক একটা আয়না নয়; এমন কি, অতি উন্নত কোনো যান্ত্রিক বৈদ্যুতিক কমপিউটারও নয়। শুধুমাত্র গুরুমস্তিষ্ক বল্কলে প্রায় চোদ্দ কোটি জীবন্ত স্নায়ুকোষ এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বাস্তব উদ্দীপক সমূহের প্রভাবে বিশেষ ধরনের স্নায়ুকোষের যে আণ্বিক পরিবর্তন এবং বহুবিধ সংযোগ ঘটে, লৌকিক ভাষায় তাকেই আমরা 'মুদ্রণ' বলি। অগ্রপায়ী পর্যায়ের মুদ্রণ থেকেই, 'প্রতিফলন' সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারটি কোনো বিশুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়া নয়; নিতান্তই বাস্তব শারীর-বৃত্তীয় পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াগত পরিবর্তন। এই পরিস্থিতির মূলে রয়েছে অন্তর্ন শর্তহীন এবং শর্তহীন পরাবর্তের পৃথক রচনা। আগেই বলেছি—সার্থক শব্দ (word) শেখার ভিত্তি হল দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের শর্তহীন পরাবর্ত শৃঙ্খলা। এর সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন গুরুমস্তিষ্ক বল্কলের সংশ্লেষণমূলক এবং বিশ্লেষণমূলক কর্মধারার ব্যাপারটি। এই কর্মপদ্ধতির মূল রহস্য হল একটি কোষ কোনো কারণে উদ্দীপিত হলে সেই উদ্দীপনা কম বেশি পরিমাণে তরঙ্গের আকারে সংশ্লিষ্ট কোষগুলিতে সঞ্চারিত (irradiated) হওয়ার প্রবণতা এবং তৎসহ উত্তেজনা (excitation) ও নিস্তেজনা (inhibition) নামক দুটি বিপরীত ধর্মী ক্রিয়ার যান্ত্রিক সমন্বয়।

এই দুটি ব্যাপারের সম্মিলিত কর্মশৃঙ্খলার ফলেই বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশদ বিশ্লেষণ ও বিনিশ্চায়ক (discriminative) উপলব্ধি এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার সংকেতধর্মী সংশ্লেষণ সম্ভব হয়।

গুরুমস্তিষ্ক বল্কলের এই বিশ্লেষণী সংশ্লেষণী কর্মশৃঙ্খলার দৌলতেই শিশু পরিবেশ থেকে শিখে ফেলে একটি বাক্য থেকে—শুধু সংগৃহীত শব্দ সম্ভারের সাহায্যে—একের পর এক সার্থক বাক্য সৃজন করতে পারে। যেমন—যে শিশু মা বাবা দাদা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধবাচক শব্দ শিখেছে বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায়, সে যখন 'মা যাই' (= মা যাই = মার কাছ যাব) শিখে ফেলে, তখন 'বাবা যাই' প্রভৃতি নতুন সংশ্লেষণমূলক বাক্য গঠন করার জন্যে তাকে আর আচরণবাদী কায়দায় যান্ত্রিকভাবে পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয় না।

মাঝে মাঝে মনে হয় চমস্কি ব্যাপারটি খানিকটা বুঝেছেন ঠিকই। কিন্তু কোনো এক গূঢ়তর কারণে আধা শারীর-বৃত্তীয় আধা কার্তেসীয় ভাষার জটিলতায় বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনাকে ঘোলাটে করে রাখতেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিশদ শারীর-বৃত্তীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে ঢুকে গেলে পাছে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে মেনে নিতে হয়—এই 'ভয়ে' : আরও অনেক রথী মহারথী যেমন করেন। হয়তো এঁরা সবাই একটা মানসিক রোগে ভুগছেন; আর সে ব্যাধির নাম বোধ হয় "সেরিংটন এক্সিংটন কমপ্লেক্স্।"

ভারতের বধির শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*

অনুভূতি বসু

সীমিত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের মত বিরাট, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমস্যাসঙ্কুল দেশের বধির শিক্ষার ইতিবৃত্তটি উদ্ধার করার কাজটি সহজ নয়। মাত্র ১৫ দিনে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে, সেগুলির উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণী রাখার চেষ্টা করলাম। আমাদের কথা এই যে, 'কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ডেফ' ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের সংক্ষিপ্ত পাঠচক্রের আয়োজন করে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করবে, সেগুলির সংকলনের ফলে সর্বভারতীয় বধির শিক্ষার একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রাক-বৈদিক যুগ থেকে। তাই সুদূর অতীতকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অনন্য সাধারণ অবদান মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে অতীতের মণীষিরা বধির শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ছিলেন। মূক মুখে ভাষা দেবার জন্যে দৈবকৃপাই ছিল অতীতের একমাত্র সম্বল, অথচ খ্রীষ্ট জন্মের বহুপূর্বেই ইউরোপে অ্যারিষ্টটল প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বধির শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান মন্তব্য রেখে গিয়েছেন।

বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতের ইতিহাসে একটা নৈরাশ্যপূর্ণ যুগের সূচনা হল মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে। তখন প্রকট হয়ে উঠলো ধর্মবিদ্বেষ, কুসংস্কার, অজ্ঞতার অন্ধকার এবং জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা। সেই সময় ভারতের শিক্ষাধারায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন সদ্য বিদেশাগত মিশনারীরা, এঁরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার দৃঢ় ভিত্তির উপরে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। শিক্ষার উদার ক্ষেত্র থেকে এই বধির শিক্ষাও বাদ পড়ল না। মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম বধির বিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটল ১৮৮৪ সালে তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সীর মাঝ-গাঁও নামে এক জায়গায়। তারপর ১৮৯৩ সালে কলকাতায় ও ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ ভারতের পালামকোটায় যথাক্রমে ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে শিক্ষার বীজ রোপণ করা হয়েছিল তা স্বাভাবিক নিয়মেই বিকশিত হচ্ছে, যদিও তার যাত্রাপথ কোনদিনও সহজ সরল ছিল না। বহু সমস্যা জর্জরিত এই বিরাট দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত হীনতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব এর চলার পথে বারবার অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। যাইহোক, এর যাত্রাপথটিকে সহজে বোঝার জন্যে একে আমি তিনটি কালে চিহ্নিত করেছি। প্রথমটি হল ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত—এই শিক্ষার সূচনা ও এক অর্থে প্রতিষ্ঠার কাল। দ্বিতীয় কালটি বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে শেষ হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের বছরে। ১৯৪৮ থেকে অদ্যাবধি চলছে তৃতীয় কালটি।

(৭-১৩ই জানুয়ারী ১৯৮২, কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে কমন ওয়েলথ্ সোসাইটি ফর দি ডেফ, লণ্ডন, যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন সেখানে রচনাটি পঠিত ও আলোচিত হয়)

ন্যায়নীতি: মানবতাবাদের বাস্তব প্রয়োগ

পরিতোষ ভট্টাচার্য

[বিশ্ব পরিসংখ্যান অনুসারে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪৫ কোটি প্রতিবন্ধী ছড়িয়ে আছে—যার মধ্যে ৪ কোটি ২ লক্ষ অন্ধ এবং ৭ কোটি বধির। উপরিউক্ত সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা। এই বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণের দৈন্য দুর্দশা অপনোদনের জন্য এবং এইদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও বিশ্বমানবের দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮১ সালটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন।]

সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবতাবাদ শুধুমাত্র একটি শ্লোগান সর্বস্ব কথার কথা নয়, পরন্তু একটি বাস্তবসম্মত প্রয়োগবিধি বিশেষ। যে কোন সমাজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে এটি এক অব্যর্থ মানদণ্ড।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কেবল মাত্র মৌখিক সহানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শুরু থেকেই, এই দেশ প্রতিটি শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিবন্ধীকে একজন সুস্থ, স্বাভাবিক এবং সৃজনশীল সদস্য হিসাবে সমাজদেহে তাকে অঙ্গীভূত করে আসছে। দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ একটি সর্বব্যাপক ও বাস্তবসম্মত প্রয়োগ বিধি ছাড়া কেবলমাত্র সামান্য সহানুভূতি বা দুচারো কিছু দানধ্যান প্রতিবন্ধীদের আত্মমর্যাদা বোধকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তাদের মনের মধ্যে হীনমন্যতার উদ্রেক করে।

প্রতিবন্ধীরা সোভিয়েত আইন ও সংবিধানে স্বীকৃত প্রতিটি সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার অবাধে সম্ভোগ করে। দেশের দৈনন্দিন জীবনে যাতে প্রতিবন্ধীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে ও পুনর্বাসিত হতে পারে তার জন্য ভি. আই. লেনিন গোড়া থেকেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করে গেছেন।

দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করে আসছেন তার পারস্পরিকভাবে সুসংবদ্ধ তিনটি দিক আছে : যথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক সুযোগসুবিধা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সমাজজীবনের মূল ধারার সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের সংযোজিত করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হোল তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এইজন্য সারা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহুসংখ্যক বৃত্তিগত শিক্ষা শিবির ও বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এইপ্রকার সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার

অধীনে প্রতিবন্ধীদের বহু বৃত্তিগত শিক্ষা পুনর্শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 'মিনিষ্ট্রী অফ্ সোশাল সেনটেনাস অফ দি ইউনিয়ন রিপাবলিক'ও এই প্রকার অনেক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। ১৫ থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত প্রতিবন্ধী যোক্তিং স্কুলগুলোতে পেশাগত শিক্ষা লাভ করতে পারেন। বিশেষ লক্ষণীয় এই শিক্ষালাভের জন্য যাবতীয় খরচ রাষ্ট্র বহন করে।

মৌলিক উপাদান

সোভিয়েট ইউনিয়নে শিশু প্রতিবন্ধীদের চারভাগে ভাগ করা হয়: মূক-বধির, অন্ধ, জড়বুদ্ধি এবং পঙ্গু। প্রতিবন্ধী শিক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি মৌলিক দিক আছে। প্রথমত, এখানে এমন কোনো কাণাগলি (blind alley) জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই যেখান আটকে থেকে প্রতিবন্ধীরা পুনরায় শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের বিশিষ্ট অসুবিধা-স্তরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংগতিপূর্ণ। বহুদিনের গবেষণা ও প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে সোভিয়েট প্রতিবন্ধীদের সর্বজনীন সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন ধরন

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ১৫ রকমের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। মূকবধির, অন্ধ, জড়বুদ্ধি ও পঙ্গুদের নিয়ে যে চারটি ভাগ আছে, গুরুত্বভেদে এগুলিকেও আরও কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন বধিরদেরও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সম্পূর্ণ বধির, স্বল্প শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি; শৈশবশেষে বধির এবং প্রান্তবয়স্ক বধির। প্রতিটি শিশু যে যে অনুপাতে ক্ষীয়মান শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সেই শক্তিকে ভিত্তি করে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও উচ্চস্বরে ধ্বনি ক্ষেপন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। ৮ বৎসরের সাধারণ পাঠ্যক্রম স্কুলে যাওয়া বধিরদের জন্য ১২ বৎসর করে দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা চলছে ১০ করার জন্য। যে সব শিশুদের দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ, তাদের বিদ্যায়তনগুলোকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদম অন্ধ, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির কিছুটা যাদের আছে, স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ২০% পর্যন্ত যাদের আছে;—এদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

অন্ধ ছাত্ররা নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করার জন্য ধ্বনি তরঙ্গমালার যথার্থতা নিরূপণে সাহায্য-কারী যন্ত্রসমূহের সাহায্য লাভ করে। আলোকোজ্জ্বল ডেস্ক, বড় বড় টাইপে ছাপা টেকৃই বই, সুবৃহৎ চিত্রপঞ্জী (Illustrations), বিশেষ ধরনের (closed circuit) দূরদর্শন যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছাত্রদের প্রয়োজনানুসারে। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের ন্যায় অন্ধ শিশুদের পক্ষেও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বা তার কাছাকাছি শিশু কিংবা স্নায়বিক ত্রুটিযুক্ত শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিচালনা

করা হয় অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তিভিত্তিক মানদণ্ডের বিচারে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সংগে সব সময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হয়।

'ইউ. এস্. এস্. আর একাডেমী অফ মেডাগগীক্যাল সায়েন্স'-এর অধীন ১৩টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে 'ইনষ্টিটিউট অফ্ ডিফেক্টোলজি'ই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজ ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানের আধুনিকতম ফলগুলিকে কাজে লাগিয়ে আসা হচ্ছে।

'অল রাশিয়ান সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড' এবং 'অল্ রাশিয়ান সোসাইটি ফর দি ডেফ-এর' মত গণপ্রতিষ্ঠানগুলি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সুবিধার জন্য, বিশেষ করে স্কুল ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে চালিত করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কাজকর্মকে আরও সুবিধাজনক ও সহজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের ধাত্রীমিতারাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'অল্ রাশিয়ান সোসাইটি ফর দি ডেফ'-এর দ্বারা প্রকাশিত বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা V. Yedinom Strovm মারফৎ এবং 'ইউনিভার্সিটি ফর দেয়ারসেল্ভস' ও বিশেষ ক্লিনিক-এর দ্বারাও এরা অনেক উপদেশ পেয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে অভিভাবক ও ধাত্রী-পিতাদের প্রায়ই সম্মেলন বসে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য এই সর্বব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারী অনুদানেই চলে। দেশময় সুবিস্তৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ১৬ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোকেদের জন্য বিভিন্ন ধরনের চল্লিশেরও বেশী রকমের প্রশিক্ষণ বৃত্তি ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

মাধ্যমিক পর্বে কোনো কলে কারখানায় যোগদানের সাথে সাথেই বহু অন্ধ ছাত্র উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করেন। অন্ধ ছাত্রদেরকেও অন্যান্য ছাত্রদের মতন সমান সুযোগ দেওয়া আছে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্য। সোভিয়েটে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ছয়শোর বেশী অন্ধ ছাত্র আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ বৃত্তি ছাড়াও এরা অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভাতা পেয়ে থাকে।

কর্মসংস্থান

সুস্থ লোকেদের মতই সোভিয়েত রাশিয়ায় কাজ করতে ইচ্ছুক বা সক্ষম প্রতিবন্ধীদের কাজ দেওয়ার দায়িত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃত। আইনত কর্ম প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ২ ভাগ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করা থাকে। এটি একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় যে অন্ধ লোকেরা অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় সাফল্যের ফলে কোটার অতিরিক্ত ভাগ কেড়ে নেয়।

যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা সাধারণ উৎপাদন কাজে অক্ষম, তাদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত দোকান ও কর্ম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। কাজের ঘন্টা এদের কম এবং বাৎসরিক সবেতন ছুটির দিনও বেশী। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের লাভের ৫০ ভাগ খরচ করতে পারে

উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের এবং প্রতিবন্ধীদের আর্থিক উৎসাহ প্রদানের জন্য। যে সমস্ত প্রতিবন্ধীরা কলে কারখানায় কাজ করতে অক্ষম তাদের নিজেদের বাড়ীতেই কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

কলে কারখানায় বা কোন প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটার পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নে আংশিক প্রতিবন্ধীদের বেলায় সেইখানেই কাজ পাওয়ার অধিকার আছে। কাজের সময় তাদের কমিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মজুরী তাদের পূর্বের মত একই থাকে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য পেশাদারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আগামী দিনগুলিতে আরও ক্রমোন্নতির দিকে যাবে। এখনই এদের জন্য ৪০টি শিল্পে কাজের ব্যবস্থা আছে (রেডিও, যোগাযোগ, পাউরুটি প্রস্তুত, কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসায়ের হিসাব লেখা, দর্জির কাজ, টাইপোর্ডের কাজ, ঔষধ প্রস্তুতকারী পরীক্ষাগারে কাজ ইত্যাদি)। 'অল রাশিয়ান সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড' পরিচালিত উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে হাজার হাজার অন্ধ চাকুরী করে, ২৫০০ এরও অধিক রকমের জিনিষ এইসব কেন্দ্রগুলিতে তৈরী হয়, অনেক কিছু রপ্তানীও হয়। মাহিনা ছাড়াও অন্ধ প্রতিবন্ধীরা এখানে পদ্ম ভাতাও পেয়ে থাকে।

অন্যান্য সুবিধা

সোভিয়েটে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব সামাজিক নিরাপত্তা বিধায়ক ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা হোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত সংবিধানের ৩৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে "সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিটি নাগরিক—বার্ধক্যে, ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবন্ধী দশায় অথবা উপার্জনশীল ব্যক্তির অভাবে—রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ভরণপোষণের অধিকার লাভ করবে।" সেখানে প্রতিবন্ধী দশা ঘটার সময় কারণ নিরপেক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ভাতার বিধি ব্যবস্থার বিধান আছে। শুধুমাত্র পুরোপুরিভাবেই নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধীদেরও ভাতা দেওয়া হয়। আয় থেকে কোনোরকম কাটছাট ছাড়াই তারা এই বৃত্তি পেয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে পাওয়া এইসব মাসিক বৃত্তি ও ভাতা ছাড়াও আরও অন্যান্য বহুপ্রকারের সুযোগ সুবিধা তারা পায়। তাদের যাবতীয় চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের (রাশিয়ার প্রতিটি ব্যক্তি বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভ করে)। প্রতিবন্ধীরা তাদের কাজকে যাতে আরও সহজ করে নিতে পারে তার জন্য তাদের নানারকম যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য দেশজুড়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ প্রতিবন্ধীরা বিনা পয়সায় এই সব সাজসরঞ্জাম পেয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত যানবাহন—চাকাওলা চেয়ার গাড়ী, ঘুচাকাওলা চেয়ারগাড়ী, মোটরযুক্ত চাকাওলা চেয়ার গাড়ী, পেশী নিয়ন্ত্রিত গাড়ী—প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিনা পয়সায় অথবা খুবই কম মূল্যে বিতরণ করা হয়, তারা আলানী কেনার জন্য এবং গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সরকারী অর্থানুকূল্য লাভ করে। কোনো কোনো শ্রেণীর প্রতিবন্ধীরা বিনা ভাড়াতেই শহরের যানবাহন ব্যবহার করতে পারে, উপরন্তু সব শ্রেণীর প্রতিবন্ধীরাই শতকরা ৫০ ভাগ কম ভাড়াতেই জাহাজ, প্লেন ও ট্রেনে

অনড় ও শাশ্বত কোনোকিছুর সঙ্গে একাত্মীয়তার মাধ্যমে যাবতীয় শক্তি সঞ্চয় করে। মতান্ধরাই যথাযথ স্থিতিধর্মী হয় এবং পরিবর্তন ও সংস্কারের বিরুদ্ধাচারণ করে। সবরকম ধর্মীয় সংঘর্ষে দেখা যায় প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষাধারীরা যুদ্ধ করে চলেছে যা কিছু ক্ষয়িষ্ণু ও মরণশীলতারই পক্ষে। গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ক্যাথলিকরা একসময় যুদ্ধ করেছিলেন, এবং সংস্কারপন্থা থেকে সনাতন পন্থায় যখন তাদের রূপান্তর হোল—এঁরাই তখন প্রোটেস্ট্যান্টদের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ এক যুগের মতান্ধরা ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে গোঁড়ামির সপক্ষে ছিলেন, আবার অন্যযুগের মতান্ধরা ক্যাথলিকবাদের সপক্ষে প্রটেস্ট্যান্টবাদের বিরুদ্ধে গেলেন। জ্ঞানবিরোধী (obscurantist) মূল চারিত্রিক কাঠামো একই জায়গায় রইল যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের দলগত অবস্থান পাল্টে গেল। ইতিহাসের এক অধ্যায়ে যা সংস্কার পন্থানুক্ত, অন্য অধ্যায়ে তাই পাল্টে যায় মতান্ধতায়—এরূপ হয় যখন সমাজের পরিবর্তিত বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। 'সন্দেহবাদী' ধারণার অনুগামীরা ভুল করে সবরকম ইতিবাচক মতবাদকেই মতান্ধতা বলে উড়িয়ে দিতেন। কাউণ্ট ঠিক এভাবেই Descartes ও Wolff কে একই ধরনের মতান্ধ বলে অভিহিত করেন। যে সমস্ত উন্নতদেশে ধর্মীয় গোঁড়ামী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে সেখানে তার স্থান নিচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মতান্ধতা। এহেন গোঁড়া মতান্ধ ব্যক্তিরা পৃথিবীর ক্রমবিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন অস্বীকার করেন, সমাজ বিবর্তনের স্থায়িত্ব ধারণার এবং বাস্তব অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের বিরোধিতা করেন। এই সমস্ত মতান্ধ ব্যক্তিরা কখনও Marx স্তুতি করেন, কখনও Spengler উদ্ধৃত করেন : কখনও বা উত্তপ্ত হৃদয়ে বৈপ্লবিক অগ্রগতির গুণগান করেন, কখনও বা বিষণ্ণচিত্তে চক্রবৎ অধোগতির কথাও প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়-অন্তরে তাঁরা পুরনোদিনের অন্ধবিশ্বাসীদেরই দোসর।

কুসংস্কার :

বিগত কুড়ি বছর জাতিগত কুসংস্কার নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক অনুশীলন চলছে, এবং জাতি ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক নতুন নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু কুসংস্কার এবং জ্ঞান বিরোধিতার (obscurantism) সম্পর্ক বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা সঠিকভাবে সুনির্দীত হয় নি। মতান্ধতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিমূর্ততা সার্বিক ও সাধারণ, কিন্তু কুসংস্কারের ক্ষেত্রে তা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট। নিগ্রোর বিরুদ্ধে একজন শ্বেতকায়ের কুসংস্কার, মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজনঃসনাতনপন্থী হিন্দুর কুসংস্কার, সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের উদ্দেশ্যে রচিত যে কোনো সাংবিধানিক পরিবর্তন ও আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে। এরাই অন্য ক্ষেত্রে আবার যথেষ্ট যুক্তিপরায়ণ হয়; সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয় তাতে সম্মতি দান করে।

একজন মতান্ধ ব্যক্তি যেখানে শাস্ত্র এবং বিশেষজ্ঞ উদ্ধৃত করেন, ইতিহাসের উদাহরণ দেন, সেখানে একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নিছকই নিজের কিছু ব্যক্তিগত আবেগানুভূতি, বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে প্রকাশ করেন। কিন্তু এ-থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল যে একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সহজেই

যুক্তিবাদী করা চলে। কুসংস্কার ও জ্ঞান বিরোধিতার মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে গেলে, আমার মনে হয়, কুসংস্কারের ভিত এবং ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সামনে আরও একটু পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ছবি থাকা দরকার। কুসংস্কারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "এমন এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীকে যা বিভেদপন্থার কারণ ঘটায়, সমর্থন করে ও তার গ্রাহ্যতাকে প্রতিপাদন করে"। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হোল মানসিক অবস্থা হিসাবে কুসংস্কার কি ভাবে বিভেদপন্থামূলক ক্রিয়া-কলাপকে প্রভাবিত করে। আপাতদৃষ্টিতে কুসংস্কারকে মতান্ধতাবাদ অপেক্ষা দুর্বল মনে হলেও জাতিগত ও গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিত্তি হিসাবে কুসংস্কার যথেষ্ট শক্তিশালী। ধর্মীয়, বর্ণ ও জাতি-গত লড়াইগুলি সংঘটিত হয় যদিও কিছু সংখ্যক লোকের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাই এই ধরনের লড়াই আরম্ভ করে ও চালিয়ে যায়। যদিও কিছু কিছু লোক এবং দল নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কুসংস্কারকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল যে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী সংস্কারাচ্ছন্নতার বেশীদিনের জন্য নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গেছে বা তাদের সভ্যতাকে অগ্রসর করতে পেরেছে। কুসংস্কার আজও বর্তমান এবং সময়বিশেষে আমাদের বাধ্য করে ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত নির্বোধের মত আক্রমণাত্মক অভিযানে লিপ্ত হতে। বোকামি বলে মনে হলেও কিন্তু সংস্কার মুক্ত হওয়া খুব সহজ নয়। সংস্কার নিজেকে ক্রমশ জ্ঞান বিরোধিতায় পরিণত করে, বিশেষ শক্তি হিসেবে নিজেকে দাঁড় করায় এবং যুক্তীকরণের সমস্ত চেষ্টাকে বাধা দেয়।

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সংস্কার সবসময়ই অন্যান্য দেশ, জাতি ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে মিথ্যে কতকগুলো ধ্যানধারণা নিয়ে চলে। সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বিচার করা হয় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে নয়; সংখ্যাগুরু হিন্দুরা ঐ সমগ্র সম্প্রদায়ের সব সদস্য সম্পর্কে এক অতিরঞ্জিত ও বিকৃত ধারণা থেকেই ঐ ব্যক্তিটিকে বিচার করেন। হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ (যারা নিজেরাই খুব সম্ভবত সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন) মহম্মদ ঘোরী বা আওরঙ্গজেবের অপকীর্তি যেভাবে বর্ণিত করেছেন তা যেন মুসলমান সমাজের প্রতিটি সদস্যের উপরই প্রযোজ্য। এইরূপ সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির সংগে হয়ত কোনো উদারচেতা ও সহৃদয় মুসলমানের ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, কিন্তু তিনি সেটা বেমালুম ভুলে যান। কিংবা মনে পড়লেও ঐ ব্যক্তিটিকে ব্যতিক্রম বলে উড়িয়ে দেন। সংস্কারাচ্ছন্ন মন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কাউকেই বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে দেখে না। সকলেই সেখানে বিমূর্ত ও সর্বজনীন কতকগুলি অপকীর্তির প্রতিনিধিস্বরূপ। অথবা ব্যক্তি হিসাবে তাকে মেনে নিলেও তাকে স্থান দেওয়া হয় সমাজের সর্বনিম্ন ধাপে। যাবতীয় নিকৃষ্টগুণ তার ওপর আরোপ করা হয়। ব্রিটীশ আমলের সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বাঙালীরা চাকর বলতে বিহারী, মালী বা ঝাঁদুনী বলতে উড়িষ্যার অধিবাসী বুঝতেন এবং প্রায় সব মুসলমানকেই লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িক ভাবতেন। এই বোঝার মধ্যে কোনো বিশেষ মতলব ছিল না বা চিন্তাভাবনার বালাই ছিল না। যুক্তির মুখোমুখী হলেই তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। এমনকি সেই সময়ের মত পেছিয়েও যেতেন। কিন্তু পরের দিনই আবার বিবেকবর্জিত হয়ে একই মন্ত্র আউড়িয়ে যেতেন। এর জন্য অজ্ঞতাকেই একমাত্র দায়ী করা যায় না। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও এই [illegible]

সংস্কারাচ্ছন্ন মতিগতি প্রদর্শন করতেন। সুদূর কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা অনিশ্চিত কোন গোষ্ঠী সুবিধা এখানে উপস্থিত থাকলেও, তাই দিয়েই এই ধরনের উগ্র সংস্কারাচ্ছন্নতাকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তারা নিজেদের কখনই পাল্টাতে চান না। মতান্ধতাক্রান্ত যেমন কোনোরকম সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্তনের বিরোধী, সংস্কারাচ্ছন্নরাও অপর কোনো জনগোষ্ঠি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে পরাঙ্মুখ। প্রথমোক্তরা যেমন স্থির বিধি সিদ্ধান্তে অবিচল, দ্বিতীয় জনেরাও তেমনি সংস্কারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত। উভয়েই উন্নত আলোকপ্রাপ্ত জীবনের বাধাস্বরূপ। উভয়েই অগ্রগতির অন্তরায় ও অন্ধকারমতি। উভয়েই তাদের অন্ধকারময় মনোজগতের অতল গহ্বরে নিশ্চিত আশ্রয় খোঁজেন। উভয়েই obscurantism-এর শিকার।

বাঁধাধরা ছকে বিশ্বাস ও জ্ঞানবিরোধিতা (Stereotypy and Obscurantism)

Stereotype শব্দটি সমাজতত্ত্ববিদ ও মানুষমনস্তাত্ত্বিক—উভয়েই ব্যবহার করেন। মনোরোগ-চিকিৎসকরা এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন উন্মাদরোগীদের বাহ্যিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজকর্ম, অঙ্গভঙ্গী ও কথাবার্তা বোঝাবার জন্য। সমাজতত্ত্ববিদরা stereotype বলতে মনে করেন কোনো জাতি, গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশেষত্বগুলিকে। এইভাবে শ্রেণী বিভক্তি-করণের পদ্ধতি ভুল ও ক্ষতিকর। কারণ এর দ্বারা গভীর আবেগপ্রবৃত্তি-প্রবণতার সঙ্গে অহেতুক পছন্দ অপছন্দ বা অনুমোদন অননুমোদনের ধারণাকে জুড়ে দেওয়া হয়। এ বিষয় আমরা ইতিমধ্যেই এই লেখায় আলোচনা করেছি। আরও বিশদভাবে উদাহরণ দিচ্ছি। সমস্ত ইটালিয়ানদের যাবতীয় ব্যক্তিগত প্রভেদ পার্থক্যকে উপেক্ষা করে 'Wop' বলে এক কথায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই ধরনের শ্রেণীবিভাজনের কোনো ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। এই ধারণা অনুসারে আগে এক ব্যক্তি 'Wop' এবং পরে সে একজন ইটালীয় সেন্‌র বা ব্যবসায়ী, এক ব্যক্তি প্রথমে নিগ্রো পরে সে একজন ব্যক্তি। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের মূল্যায়ণ ব্যক্তি ও সংঘের মধ্যে যে বিরোধ তারই এক উদ্ভট কল্পনা থেকে উৎপন্ন। উপরন্তু এইসব ব্যাপার আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি কোনো এক প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিকের। তিনি মন্তব্য করেছেন যে বাঁধাধরা ছকে বিশ্বাস মানবিক বিচারবোধকে বিকৃত ও বিপথগামী করতে পারে। এইরকম অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, বিকৃত বিচারবুদ্ধি, ব্যক্তির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের অবলোপন, প্রমাত্মক গুণগুলিকে সর্বাত্মক গুণ- বিশেষের ওপর স্থাপন করা—মস্তিষ্কের কিয়দংশকে ক্রমশ অনড়ত্বের দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের জড়তা মস্তিষ্ক কোষগুলির নমনীয়তাকে নষ্ট করে দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মস্তিষ্কও ছকে বাঁধা একইভাবে কাজ করতে থাকে। এইভাবেই Stereo-typy থেকেই obscurantism এর জন্ম হয়।

জ্ঞানবিরোধিতা এবং মস্তিষ্ক :

এখন দেখা যাক বিশেষ কোনো বিশেষ ধরনের মস্তিষ্কের সঙ্গে জ্ঞানবিরোধিতার সম্পর্ক আছে কিনা।

সুষমভাবে সমান ভারসাম্য যুক্ত মস্তিষ্ক কোষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের দুটি মৌলিক গুণ, উত্তেজনা ও নিস্তেজনা যেখানে পরস্পর সমান, কিন্তু (lability) গতিময়তা স্বাভাবিক স্তরের নীচে, সেইসব ক্ষেত্রে obscurantism অধিক মাত্রায় দেখা দেয়। এই ধরনের ধীরগতি মস্তিষ্ক পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাস্তব পরিবর্তনে সাড়া দেয় না। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ও প্রতিরক্ষামূলক উপাদানগুলি তার ভাবগ্রাহী অংশটিকে সংকুচিত করে দেয়। বহির্জগতের পরিবর্তনগুলির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করার নিষ্ফল প্রচেষ্টাহেতু যেসব ব্যথাবেদনা মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়, তার চাপ থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। অবস্থাটা আরও জটিল হয়ে যায় যখন ঐ সমান ভারসাম্যযুক্ত মস্তিষ্কে প্রথম সাংকেতিক স্তরের আধিপত্য থাকে—তার অনুভূতিগ্রাহী অংশ যদি অতিরিক্তমাত্রায় ক্ষমতাশীল হয়। মনে রাখা দরকার আমাদের অনুভূতি ও মানসিক ক্রিয়ার মন্থরতা দ্রুতগামিতা নিঃসন্দেহে কর্মতৎপরতা ও সংগে সংগে টিকে থাকার ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্রুত ক্ষমতার গুরুত্ব খুবই। নিজের তাৎক্ষণিক লাভের সংগে সম্পর্কিত না হলে জ্ঞানবিরোধিতাকে (obscurantism) মস্তিষ্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলে ধরে নিতে হবে। এইক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্রিয়াপদ্ধতিকে আমরা অন্য আর এক ভাবে দেখতে পারি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশে সূক্ষ্ম একটি প্লাটিনাম ইলেকট্রোড প্রবিষ্ট করে দিলে এমন কতকগুলি শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায় যেগুলি তাদের জটিল ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিকতা কি হবে তা নির্ধারিত করে দেয়। সেচেনভ একেই বলেছেন obscure feeling বা দুর্বোধ্য অনুভূতি। এইরূপে উত্তেজিত অংশগুলি মস্তিষ্ক অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি নিউক্লিয়াস। কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এই অংশগুলি অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। তারা সাধারণত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না বা অল্পক্ষেত্রেই পারে। তারা বহির্জগতের যাবতীয় পরিবর্তন প্রতিরোধ করে, তাদের মধ্যে জ্ঞানবিরোধিতা জেগে ওঠে, অন্তর্যায় intercerebral nuclei-এর ক্রিয়াধর্মের ব্যতিক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা হেতু মানবিক অস্বস্তি ও উত্তেজনা বলতঃ তারা ভয় এবং পীড়ণ যন্ত্রণা অনুভব করে। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষদীক্ষা উচ্চ মস্তিষ্কের প্রতি আবেদন এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা obscurantism দূরীকরণে অপারক। Nuclei-এর ওপর ঔষধ বা শল্যচিকিৎসাই তখন নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারে।

জ্ঞানবিরোধিতা-এর স্বরূপত্ব

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্তিত করে; আবার পরিবর্তনের সংগে সংগে নিজেকেও পাল্টায়; আর অন্যান্য প্রাণীরা নিজেদের প্রকৃতির উপযোগী করে তোলে। কারণ নিজের বা প্রকৃতির পরিবর্তন করা তাদের সাধ্যাতীত। বলা চলে বা সিদ্ধান্ত করা যায়,—প্রাণীজগৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে যতটা ভয় পায়, মানুষ ততটা ভয় পায় না। কিন্তু সবসময় এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের যুগে—মহাকাশ বিজয়ের যুগে বিজ্ঞানীর মনেও obscurantism বিদ্যমান। আমি মিথ্যা-সংবাদপুষ্ট বা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত obscurantism নিয়ে ভাবছি না, সেখানে ওটা মনের গভীরে বাসা বাঁধতে পারে না। আমি

শিক্ষিত ও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মজ্জাগত obscurantism সম্পর্কে বেশী উদ্বিগ্ন। প্রথমোক্ত দলের লোকেরা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাগহ্বর থেকে আলোকের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন; অন্যরা আলোকে পরিহার করে চলেন, এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অন্ধকার-প্রিয়। মনোবিদরা এই ব্যবহারের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারেন। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষ উচ্চ স্তরের, কারণ সে চিন্তা করতে পারে এবং সে সততই আত্মানুসন্ধানী। চেতনার সাহায্যে সে পরিবর্তনকে যেমন বোঝবার চেষ্টা করে তেমনি তাকে সংঘটিতও করতেও পারে। পরিবর্তনের গুরুত্ব কি? 'সত্তা' বা 'অস্তিত্ব'-এর শেষ পরিণতি কি? আত্মবিলয় বা মৃত্যু। এই মৃত্যুভয়, এই আত্মঅবলুপ্তির চেতনা মানুষকে পরিবর্তনবিমুখ করে তোলে, সে ভয় পায়। সর্বযুগে এবং সর্বদেশে ধর্ম আত্মার অমরতা ও অবিনশ্বরতার কথা বলেছে। শাশ্বত পরমাত্মার এবং শাস্ত্র সমূহের অভ্রান্ততার কথা প্রচার করে এই মৃত্যু ভীতি দূর করবার চেষ্টা করে আসছে। প্রথমটায় আত্মঅবলুপ্তি ভীতি থেকে পরিবর্তনের ভীতির জন্ম: আত্মসংরক্ষণের মিথ্যা চেষ্টা। তারপর ধর্মশাস্ত্র দ্বারা এই ভীতি প্রতিপালিত। যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, ধর্ম নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে, সবরকমের পরিবর্তনকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে এসেছে।

মনস্তত্ত্ববিদরা ধর্মকে সমাজচেতনার একটি বিশেষ রূপ বলে গণ্য করেন, যা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে এক বিশ্বজনীন, চিরন্তন ও অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে। সমস্ত ধর্মেরই মূল এবং প্রধান দিক এক অপরিবর্তনীয় ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন। এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ বিরোধ। বিজ্ঞানও একধরনের সমাজচেতনার রূপ যা ঐতিহাসিক ধারায় বিবর্তিত জ্ঞানময় জগতকে প্রতিবিম্বিত করে, তার সত্যতাকে যাচাই করে নেয় এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীখে তাকে সঠিক করে তোলে। ধর্ম বাস্তবতার এক উদ্ভট, অলীক এবং বিকৃত চিত্র গড়ে তোলে। বিজ্ঞান তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গড়ে তোলার পক্ষপাতী; বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট—যুক্তিনির্ভর চিন্তা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীলতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি। এই কারণেই বিজ্ঞান ও জ্ঞানবিরোধিতা পরস্পরের শত্রু। এ যুগের বিজ্ঞান বিরোধীরা, বিজ্ঞানকে মুখোমুখি আক্রমণ না করে, মানুষকে অজ্ঞেয়-বাদের অন্ধ অনুবর্তী ও ধর্মের অনুগামী করে গড়ে তোলে। তাঁরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং পিঠ চাপড়াতে থাকেন ততক্ষনই যতক্ষন পর্যন্ত সে শুধু সমাজের বস্তুগত পরিবর্তনগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যে মুহূর্তে বিজ্ঞান আন্তর্মানবিক সম্পর্ক, সমাজব্যবস্থা, অথবা মানুষের মনঃজগতে স্বীয় কর্তৃত্ব সীমা সম্প্রসারণে অগ্রসর হয় সেই মুহূর্তেই তারা বিজ্ঞানকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। Obscurantism যখন কোনো বিজ্ঞানী অথবা মার্কসবাদীর মনে বাসা বাঁধে (যা প্রায়শই ঘটে থাকে) তখন তার চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি ও কাজকর্মে অযৌক্তিকতা প্রকাশ পায়।

(ইংরাজী থেকে ভাষান্তরিত)

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সমাজ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের একটি শাখারই যথার্থরূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিক ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসাশাস্ত্র 'আয়ুর্বেদ'। সে আমলে অন্যান্য যতগুলি প্রচলিত বিষয়—যেমন ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, শুল্ব (জ্যামিতির পূর্বসূচনা)—সীমাবদ্ধ ছিল পুরোহিত সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণদেরই মধ্যে। এগুলোকেই বলা হত বেদের হাত-পা, 'বেদাঙ্গ'।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে গড়ে উঠেছিল আয়ুর্বেদ। অতি ধীরে, অতি কষ্টে গড়ে ওঠা এই বিজ্ঞানকে ধর্মীয় গণ্ডির বাধা পেরিয়ে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসাতত্ত্ব খাড়া করতে চরম মূল্যও দিতে হয়েছিল।

'চরক-সংহিতা'র এই ঘটনাকে 'দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ' থেকে 'যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজে' উত্তরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] অথর্ববেদে বর্ণিত 'দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ' হল এমন চিকিৎসা যার ব্যবস্থাপত্র মানে প্রার্থনা, যজ্ঞ, মন্ত্র ইত্যাদি। আর 'যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজে' রোগের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে শরীরের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক উপাদান বা 'ধাতু'র অভাব। 'চরক-সংহিতা'র সূত্রস্থান অংশেই এই প্রসঙ্গ শেষ হয় নি, বিমানস্থানেও এর উল্লেখ আছে।

কখন থেকে চিকিৎসকরা 'দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ' থেকে 'যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজে' এলেন? 'চরক-সংহিতা'র রচনাকালের সঙ্গে এই ঘটনাকে মেলাতে গেলে মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। 'চরক' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা' খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, এত জটিল ও ব্যাপ্ত রচনা এক সময়ে লেখা হয় নি। তার চেয়েও ভুল হবে, কোন 'সংহিতা'কে একজন মাত্র লেখকের কীর্তি বলে কল্পনা করা। তথ্য প্রমাণ থেকে বরং মনে হয়, চরক কোন ব্যক্তির নাম নয়। এটি একদল চিকিৎসকের নাম যাঁরা ওষুধ খুঁজে বার করে চিকিৎসা করতেন। এঁদের সঙ্গে মেলে 'চরণবৈদ্য'দের[২] যাঁদের নামে অথর্ববেদের একটি গুপ্ত শাখার নামকরণ হয়েছিল। সুতরাং ব্যক্তির সন্ধান না করে অন্যভাবে কালনিরূপণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

পালি ভাষায় 'বিনয়পিটক' নামে একটি বই আছে। আন্দাজ করা হয়, বুদ্ধের মৃত্যুর কিছু পরেই এটি লেখা হয়েছিল। এই বইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চিকিৎসাব্যবস্থার কথা আছে। সে চিকিৎসা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। অতএব মনে করা যেতে পারে যে যুক্তিবাদী চিকিৎসাব্যবস্থা সে যুগে চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় আদৃষ্ট বা অপ্রাকৃতের ওপর কোন আস্থা নেই। ধরনটা বরং 'যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজের'ই মতো। যদি আমরা ধরে নিই যে 'বিনয়পিটক' লেখার কাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক বা তার কাছাকাছি, তাহলেও বোঝা যায় বুদ্ধের আগেও যুক্তিনির্ভর চিকিৎসাপদ্ধতি চালু ছিল। এই ধারণা বুদ্ধের বহু বৈদ্য জীবকের সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তিকেও সমর্থন করে।

'চরক' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা'র যে মূল তাত্ত্বিক প্রসঙ্গটি আজকের দিনেও মূল্যবান সেটি হল পরিবেশ

ও জীবদেহের মধ্যেকার সম্পর্ক। মানবদেহে বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয়, এমনকি আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য থেকে এই প্রসঙ্গ উঠতে পারে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজের (এমনকি খুব বিরল খনিজ, যেমন 'শিলাজতু') বিরাট জ্ঞান নিশ্চয়ই বহু পুরুষ ধরে সংগৃহীত। 'চরক'-এ ৩১০টি উদ্ভিদের নাম আছে, 'সুশ্রুত'-এ ১০০টির। মানবদেহে এদের শিকড়, ছাল, মজ্জা, রস, ক্বাথ, ফল, কুঁড়ি এবং কাণ্ডের প্রয়োগ ও প্রভাব প্রসঙ্গে তাদের চিকিৎসাগত উপযোগিতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। 'চরক'-এ ১৫৭টি প্রাণী নিয়েও আলোচনা আছে। এদের দুধ, ঘি, চর্বি, মজ্জা, রস, রক্ত, মাংস, হাড়, নখ, ক্ষুর এবং শিং-ও চিকিৎসার কাজে লাগে। যেমন গোমাংসকে ক্ষয়রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে,[৩] আবার আগুনে পোড়ায় চিকিৎসায় গরুর দুধ মিশিয়ে এক ধরনের তেল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।[৪] মানুষের শরীরে কিছু কিছু খনিজ পদার্থের প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রক্তাল্পতায় লৌহ-চূর্ণের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।[৫]

প্রাচীন যুগের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রযুক্তির কথা চিন্তা করে অবাক হতে হয়: কী করে, শুধু প্রয়োজনের তাগিদে, মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য না জেনেও, অভিপ্রাকৃত ও দৈবী ধারণাকে দূর করে আয়ুর্বেদীয় বিজ্ঞানকেই হাজির করেছেন। তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের স্তর দিয়েই তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রকৃতির আর সব বস্তুর মতো মানবদেহও বস্তুমাত্র।

প্রাচীন গ্রীসের মতো আমাদেরও বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি ছিল সহজাত বস্তুবাদ, আর সেই কারণেই চিকিৎসাবিজ্ঞান এদেশের ধর্মসূত্রকার ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘৃণার বস্তু।

চিকিৎসক হিসেবে প্রাচীন বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে উৎসুক ছিলেন 'পুরুষ' অর্থাৎ মানুষ ও তার দেহ সম্বন্ধে। এ বিষয়ে দার্শনিকদের ঔৎসুক্যও কম কম ছিল না। তবে তার কারণ আলাদা। তাঁদের আগ্রহ ছিল 'আত্মা' নিয়ে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'পুরুষ'কেই আত্মন্, ব্রহ্মন্ নামে বিভূষিত করা হয়েছে (২।৫।১)।

কিন্তু চিকিৎসকের কাছে 'পুরুষে'র কোন আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল না। 'পুরুষ', তাঁদের মতে, শরীরেই নিহিত। 'সুশ্রুত'-এ পরিষ্কার বলা হয়েছে: পুরুষ মানে তা-ই যা থেকে 'পুরুষ' সৃষ্ট হয়।[৬] কিন্তু তাহলে বস্তু থেকে 'পুরুষ' এল কী করে? উত্তরে তাঁরা বলেন: মানুষ অথবা 'পুরুষ' 'রস' থেকে তৈরি হয়, তাই 'রসে'র বিষয়ে বস্তু নেবে।[৭]

এই 'রস' কী? 'রসের' ধারণাই প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের চাবিকাঠি। এর অর্থ হল এক ধরনের জৈব তরল পদার্থ, যা সদাসর্বদা শরীরের ভেতর সঞ্চরণশীল। এর থেকেই রক্ত, মাংস, মেদ, হাড়, মজ্জা ও বীর্য তৈরি হয়। পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি খাদ্য (শরীরের ভেতর) অগ্নিতে তার যে সারীভূত রূপ পায়, তাই হল 'রস'।[৮] এই ধারণাও আমাদের 'পুরুষ' সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতেই নিয়ে যায়।

প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তু থেকে মানুষের গঠন সংক্রান্ত এই মত প্রাচীন চিকিৎসকদের ধারণা দিয়েছিল প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের। প্রকৃতিজগতে যা আছে, পুরুষেও তাই আছে, পুরুষে যা আছে প্রকৃতিতেও তাই আছে—এই ভাবে দু-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকি ভ্রূণের গঠন সম্পর্কেও বলা হয়েছে, এতে (ভ্রূণে) যা-এর শরীর থেকে প্রাপ্ত অংশও বস্তুর রূপান্তরের ফল ছাড়া আর

কিছুই নয়।[৯]

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা উচিত যে এ-বিষয়টি আজকের বিজ্ঞানজগতেও আলোচিত হচ্ছে, তাতেই প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উত্তর আশা করাটা অনুচিত। তবে একজন কাউকে তো আস্থা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আরও কাজ হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা এই কাজটিই খুব সাহসভরে করেছিলেন।

চিন্তার ইতিহাসে এই ধারণা নিশ্চিতভাবে বস্তুবাদের দিকেই পদক্ষেপ। আত্রেয় বলেছিলেন: এই বিশ্বের সব কিছুকেই বস্তুর পাঞ্চভৌতিক রূপে ধরা হয়। তার সঙ্গে চেতনা যুক্তও হতে পারে, বা অচেতনই থেকে যায়।[১০]

বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট। ভাববাদীরা যাই বলুন, চিকিৎসকরা তাঁদের চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ বস্তুবাদী।

চিকিৎসকরা কিন্তু সে আমলের বিপরীতধর্মী চিন্তাধারার সন্ধান ও প্রচলন সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পেশায় কী করে তাঁরা বস্তুবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারেন? এ প্রশ্ন তাঁদেরও ভাবিয়েছিল। 'সুশ্রুত সংহিতা'র পরিষ্কার উত্তর হল: 'কৃত' অর্থাৎ বস্তু ছাড়া চিকিৎসার প্রয়োজনে আর কোন চিন্তাই তাঁদের নেই।[১১]

এই বস্তুবাদী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসেবে শরীরের নিরন্তর পরিবর্তনশীলতাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আয়ুর্বেদও সেইভাবেই শরীরকে দেখেছে। 'চরক-সংহিতা'য় বলা হয়েছে শরীরের যথোক্তার (পুরাতন ও নতুনের) সাদৃশ্য থাকায় একে সর্বদা এক বলে মনে হয়, কিন্তু এর কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়।[১২]

জীবন যেমন কতগুলি ভূতপদার্থের যথাযথ সংযোগ, তেমনি পরিবর্তনের এক সময়ে তার স্বরূপ বদলে যায়, বস্তু তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। একে বলা হয় 'মরণ'। স্বভাব ফিরে পাওয়ার ব্যাপার বলে মরণকে 'স্বভাব'ও বলা হয়। এই কারণে মৃত্যুর আরও প্রতিশব্দ হল: অনিত্যতা, প্রবৃত্তির উপরম, নিরোধ।[১৩]

চিকিৎসকরা এই দার্শনিক ভিত্তিতেই শরীরের রোগ ও নিদানের তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। চিকিৎসার 'কারণ' হল পাঞ্চভৌতিক পদার্থ, 'কার্য' হল বাত-পিত্ত-কফ এই তিন ধাতুর সাম্য। এই ধাতুসাম্য ক্রিয়াই কায়চিকিৎসাশাস্ত্রের 'প্রয়োজন'। এই সাম্যের ক্ষেত্রে কোন ধাতুর হ্রাসবৃদ্ধি রোগের সৃষ্টি করে, সেই ঘাটতি বা বাড়তির মাত্রা বাড়ানো কমানোই রোগমুক্তির উপায়। মানুষের দেহ ও তার উপর বস্তুর প্রতিক্রিয়া—এই ছিল চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তি। প্রকৃতির সূত্রকে পাল্টানো যায় না ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সূত্রগুলিকেই মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায়। 'চরক'-এ তাই বলা হয়েছে: না জানা থাকলে ঔষধ জিনিসটা বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও অশনির মতো, আর বিজ্ঞাত হলে (মানে জানা থাকলে) অমৃতের মতো।[১৩ক] অর্থাৎ প্রাচীন চিকিৎসকরাও বিশ্বাস করতেন: জ্ঞানই শক্তি।

আমরা আগেই দেখেছি, 'স্বভাব'-এর ধারণাটি চিকিৎসাশাস্ত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক পদার্থ কীভাবে আমাদের শরীরের ওপর কাজ করে? স্বভাব বা প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া এই ঘটনার অন্য

কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

কিন্তু 'স্বভাব'-এর ধারণাটি রাজনৈতিক দিক দিয়েই বড়ই বিপজ্জনক। অদৃষ্টবাদ, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও বেদান্তদর্শনের থেকে এর উজ্জ্বল্য যে অনেক বেশি অধ্যাপক হিরিয়ান্না সে কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪]

'অদৃষ্ট' মানে কী? অদৃষ্ট হল আমাদের 'কর্মে'র দোষগুণের ফলাফল। পূর্বজন্মের কর্মফলেই কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র হয়ে জন্মায়। যেহেতু 'স্বভাববাদ' এই 'অদৃষ্টবাদে'র সম্পূর্ণ বিরোধী ধারণা, তাই ধর্মশাস্ত্রকাররা স্বভাববাদকে খর্ব করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আর রাজনীতিবিদ্ না হয়েও তাই চিকিৎসকদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। চিকিৎসকরা নেহাতই পঞ্চভূত ও ত্রিধাতু নিয়ে রোগনির্ণয় করেন; অদৃষ্ট, কর্মফল ইত্যাদিকে উপেক্ষা করেই তাঁদের কাজ করতে হয়।

এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাই আয়ুর্বেদের কাল হয়ে দাঁড়াল। আয়ুর্বেদ চায় প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকাররা মানুষের ওপরেই আধিপত্য করতে চান। জনগণকে আইনমান্যকারী বাধ্য নাগরিক করার জন্যেই তাঁদের 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু 'স্বভাব'-এর সঙ্গে তো এ-ধারণা মেলে না। তাই তাঁরা আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন।

এই বিরোধিতার প্রতিফলন দেখা যাবে প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলিতে। চিকিৎসকদের সেখানে বলা হয়েছে 'অশুচি'। তাঁরা এতই অশুচি যে তাঁদের উপস্থিতিতেই শুদ্ধ পরিবেশ অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাঁদের কোন খাদ্য দান করলে সেই খাদ্য অশুদ্ধ হয়ে যায়। আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে চিকিৎসকের দেওয়া খাদ্য উচ্চবর্ণের লোকেরা খেতে পারবে না। গৌতম বলেছেন: ব্রাহ্মণরা বৈদ্যদের কাছ থেকে খাদ্য নিতে পারে, কিন্তু অশুচি শূদ্র বা চিকিৎসকদের থেকে নয়। বসিষ্ঠ বলেছেন: চিকিৎসকদের কাছ থেকে খাদ্যগ্রহণ আর বারবনিতার কাছ থেকে খাদ্যগ্রহণ একই কথা।[১৫]

এই তিন ধর্মসূত্রকারই প্রাচীনদের মধ্যে সেরা। আনু: ৬০০-৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এগুলি লেখা হয়েছিল। পরবর্তী লেখকদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'মনুস্মৃতি' (খৃ: দ্বিতীয় শতক)-তে বলা হয়েছে: চিকিৎসকদের দেওয়া খাদ্য রক্ত ও পূঁজের মতোই বর্জনীয়। চিকিৎসকের উপস্থিতিতে যজ্ঞ অপবিত্র হয়।[১৬] বসিষ্ঠ তো আগেই বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ যদি চিকিৎসাবৃত্তি নেয় তবে তার আর ব্রাহ্মণত্ব থাকে না।[১৭]

তাহলে চিকিৎসার মতো প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজ কে করবেন? মনু বলেছেন, অম্বষ্ঠরা।[১৮] ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে জানা যায়, 'অম্বষ্ঠ' একটি প্রাচীন উপজাতির নাম। কিন্তু মনু তার বদলে এক হাস্যকর জাতি-পরিচয় দিয়েছেন। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের মিলনেই এই সংকর জাতির সৃষ্টি। যৌধায়নের ধর্মসূত্রেই এ-ধারণার প্রথম সাক্ষাৎ মেলে।[১৯] পরে মধ্যযুগের টীকাকাররাও এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কিন্তু যে-কথাটা কেউই বলেন নি সেটি হল: চিকিৎসকরা ঘৃণার পাত্র কেন? তাঁরা এমনভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন যেন এটা সকলেরই জানা কথা।

চিকিৎসকদের 'অশুচি' বলার কারণ কী? তাঁরা কি ব্যক্তিগতভাবে পোষাকে-আষাকে ময়লা ছিলেন, ঠিকমতো স্নান করতেন না? 'চরক-সংহিতা'য় বরং চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি নিয়মিত দাড়ি কামাবেন, নখ কাটবেন, স্নান

পোষাক করবেন, পায়ে জুতো হাতে ছাতা ও লাঠি নিয়ে ঘুরবেন, নম্রভাবে চলবেন, সমস্ত প্রাণীর প্রতি মমতা রাখবেন—'চরক' ও 'সুশ্রুতে'র শিক্ষাই এ-ই।[২০] চিকিৎসক হবেন জীবের প্রতি দয়ায় উদ্বুদ্ধ। চিকিৎসাকে যিনি পণ্য হিসেবে বিক্রয় করেন তিনি সোনার রাশি ছেড়ে ধুলোর রাশির পেছনে ছোটেন ; চিকিৎসকের পেশা মহান্—এ কথাই 'চরকে' স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে।[২১]

অথচ ধর্মসূত্রকারেরা এক ধাপ হয়ে তাঁদের 'অপূত' বলেন। যজুর্বেদের আমলে এ ব্যাপারে একটা স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে : ব্রাহ্মণ ভেষজের কাজ করবে না। ভিষকরা অপূত, যজ্ঞের অনুপযুক্ত (তৈত্তিরীয় ৬।৩।৩)। কেন অপূত ? কারণ চিকিৎসকরা সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশেন, বর্ণাশ্রম সমাজে দ্বিজদের ছাড়াও শূদ্রদের নিয়েও তাঁদের কাজ করতে হয়। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগ রাখাটাই, যজুর্বেদের মতে, তাঁদের অবজ্ঞেয় করে তোলে। চিকিৎসকদের গণতান্ত্রিক আচরণবিধিই বর্ণাশ্রমের রক্ষকদের চোখের বালি।

মনে রাখা দরকার, বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে যজুর্বেদই সব চেয়ে অর্বাচীন। ঋগ্বেদে কিন্তু চিকিৎসকদের সম্পর্কে এ ধরনের কোন অশ্রদ্ধা নেই। বরং দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদের মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এজন্য তাঁদের অনেক গুণকীর্তন করা হয়েছে। অথচ যজুর্বেদে দেখা যাচ্ছে, ঐ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবতাদের মধ্যেও অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে। যজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও বলা হয়েছে : দেবতারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করতে রাজী নন, কারণ তাঁরা 'মনুষ্যচর', মানুষের সঙ্গে মেশেন !

আসলে সংঘাতটা কোথায় ? প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রকৃতিকে অনুশীলন করে, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাতিনির্বিশেষে মানুষের সেবাই বৈদ্যকশাস্ত্রের গোড়ার কথা। আর ধর্মাশ্রমের রক্ষাকর্তারা বারে বারে চেয়েছেন বস্তুজগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভাবলোকের কুয়াশায় মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখতে। সংখ্যালঘু সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীকে যদি সংখ্যাগুরু জনগণকে বাগিয়ে রাখতে হয় তবে প্রকৃতির ওপর রহস্য আরোপ করাটা খুবই দরকারী হয়ে পড়ে। ফলে আয়ুর্বেদ তথা বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তাই দেবতাদের পছন্দ সম্পর্কে বলা হয় : তাঁরা ঘুরিয়ে নাক দেখানোই পছন্দ করেন, 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ'।[২২] অথচ বিজ্ঞান মানেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সরাসরি চেনার ও জানানোর চেষ্টা। তার মানে, ধর্মসূত্রকারের মতে, দেবতাদের অপ্রিয় জিনিস করা। পুরোহিতদের ধর্ম তাই চিকিৎসকদের বিজ্ঞানকে এক কঠিন অবস্থায় ফেলল। এর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন পরবর্তী আয়ুর্বেত্তারা। ফলে আয়ুর্বেদ হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞান আর অজ্ঞতার এক জগাখিচুড়ি। আর এরই ফলে প্রাচীন ভারতে প্রতিভূস্থানীয় বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের কাল ঘনিয়ে এল।

এতে যে শুধু বিজ্ঞানেরই ক্ষতি হল, তাই নয়। দর্শনও এর ফলে নষ্ট হল। প্রকৃতি ও জ্ঞানের জগৎকে বাতিল করে দিয়েই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব গড়ে ওঠে। নারদের সেখা সব বিদ্যা—যার বেদ-অধ্যয়নও—সনৎকুমার বাতিল করে দেন কারণ এ সবই 'মার এব'।[২৩] আর লক্ষ্য করার ব্যাপার হল নারদের সেখা বিদ্যার তালিকায় আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা নেই (যদিও নক্ষত্রবিদ্যা ইত্যাদি আছে), কারণ

বোধহয় এটি নেহাতই নীচ ব্যাপার! উপনিষদের ভারতে মানবপ্রেমী বিজ্ঞানী-গবেষকদের আর সম্মান রইল না, বিজ্ঞানের উজ্জ্বল শিখাটিকে নিভিয়ে দিতেই বরং উপনিষদের দর্শন সাহায্য করল। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভাবাদর্শগত কারণে প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বিরোধী এমন এক দর্শন বিস্তার লাভ করল যা প্রাচীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধ্বংসকর্তা।

সূত্রপঞ্জি :

১. চরক-সংহিতা (জামনগর সংস্করণ) ১।১১।৫৪, ৩।৮।৮৭

২. Surendranath Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol. 2, Oxford, pp. 283-4 দ্রষ্টব্য।

৩. চরক ১।২৭।১১-৮০; এছাড়াও ১।৩।১১, ১।২৫।৩২, ৩।৩।২৪, ৩।৮।১৮৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৪. চরক ১।১।১০৬, ৪।৮।২৪।

৫. চরক ১।২১।২৩; ৩।৭।১১৯, ৩।১৪।৪৯, ৩।১৯।৫৮ ইত্যাদি।

৬. সুশ্রুত-সংহিতা (কাশী সংস্কৃত সিরিজ সং), ১।১।৪১

৭. সুশ্রুত ১।১৪।১২

৮. সুশ্রুত ১।১৪।১

৯. চরক ৪।৪।১২

১০. চরক ১।২৬।১০

১১. সুশ্রুত ৩।১।১৭

১২. চরক ৪।১।৪৬

১৩. চরক ১।৩০।২৭

১৩ক. চরক ১।১।২৪

১৪. Hirlyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, p. 104

১৫. আপস্তম্ব ১।৩।১৩।১৪ ; গৌতম ১১।৭, ১৭।১৭ , বসিষ্ঠ ১৪।১।১০

১৬. মনু ৩।১৮০

১৭. বসিষ্ঠ ৩।৩

১৮. মনু ১০।৪৬-৪৭

১৯. যৌধায়ন ১।৮।৭, ১।৯।৩

২০. সুশ্রুত ১।১০।২, চরক ৩।৮।৮

২১. চরক ৩।৭।৫৮-৬২

২২. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩০, শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।১।২ ইত্যাদি।

২৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১।৩

[Journal of Scientific and Industrial Research. Vol. 40, Nov. 1981, pp. 689—698-এ প্রকাশিত Science in Ancient India প্রবন্ধের এই সারানুবাদ করেছেন সমীর চৌধুরী ও স্বপন লোধ]

কুণ্ডলিনী জিজ্ঞাসা

সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের দ্বারস্থ হচ্ছি, আপনাদের অনুগ্রহে যদি একটা সদুত্তর মেলে তবে কৃতার্থ হব। যদি ভর্ৎসনাও জোটে তাহলে দুঃখ হব না। সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নটি পেশ করতে চাই।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবনায় যোগ শাস্ত্র একটি প্রাচীন প্রস্থান। কাহারো মতে যোগপথ প্রাক-বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। মোহেঞ্জদরোতে আবিষ্কৃত চুনাপাথরের ত্রিপত্রযুক্ত উত্তরীয়ধারী এক বৃহৎ যোগীমূর্তি এই অনুমানের সাক্ষ্য বহন করে। তদুপরি অর্ধনিমীলিত নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি চিত্রটিও কোন যোগীর এই অনুমানও কেহ কেহ করেছেন। বৈদিক এবং তৎপরবর্তী কালে যোগশাস্ত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দেখা যায় যে সুবিখ্যাত আস্তিক ষড়দর্শনের একটি হল পতঞ্জলির যোগদর্শন। নাস্তিক বৌদ্ধদর্শনেও যোগের সমান গুরুত্ব দেখা যায়, এতদ্ভিন্ন সর্বপ্রসারী তন্ত্রশাস্ত্রও যোগ-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিশেষ লক্ষণীয় যে, ষড়্দর্শনের যোগপ্রস্থানই হোক, কি কূর্মপুরাণোক্ত রাজযোগই হোক অথবা তান্ত্রিকযোগই হোক, এদের প্রতিটির মধ্যেই কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্দীপন, এবং সেই উদ্দীপিত শক্তির সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বারোহণ এবং অবশেষে সহস্রারে প্রবেশকরণ—এই হল যৌগিক প্রক্রিয়ার মৌলিক সাধন-পন্থা। অধিকাংশ মনীষীদের অধিকাংশের মতে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর সংযোগকেই "যোগ" বলা যায়।

আরও একটি বিষয়ে বিভিন্ন যোগ প্রস্থানের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়। তা হল মানব দেহে সুপ্ত অবস্থায় কুণ্ডলিনীর অবস্থান সম্বন্ধে। সবকটি প্রস্থানই বলেছেন যে কুণ্ডলিনীর আধারভূত পদ্ম মানব দেহে কটি দেশের একেবারে নিম্নভাগে অবস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগ গ্রন্থে এই স্থানটিকে বর্তমান শারীর-বিদ্যার Sacral Plexus-এ সন্নিকটবর্তী বলে নির্দেশ করেছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও কটিদেশের নিম্নদেশের কথাই নির্দিষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য তন্ত্রের বর্ণনাই ব্যাপক।

মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে, "গুহ্য মেঢ্রের [লিঙ্গমূল] মধ্যস্থলে মূলাধারে পদ্ম আছে। ---...এই পদ্মের মধ্যস্থলে নবপল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শোভা পাইতেছে। তদ্বিষয়া মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলয়াকৃতি হইয়া স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন পূর্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।"

সমগ্র যোগশাস্ত্রে, এবং তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আরও একটি তথ্য পাওয়া যায়। মহানির্বাণ তন্ত্রানুসারে, "জীবশরীরের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ঐ মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ...সুষুম্না নাম্নী এক নাড়ী আছে। ---অধোভাগে ইহার মুখ ধূম্রের পুষ্পের ন্যায়

বিকশিত। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যেই সমুদায় চক্র সন্নিবেশিত।" এখানে বলা প্রয়োজন যে স্বামী বিবেকানন্দ চক্রগুলিকে বিভিন্ন nerve plexus মনে করতেন। অপর পক্ষে পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাখ্যা কালে স্বামী প্রভবানন্দ এবং ক্রিস্টোফার ইশারউড চক্রগুলিকে সুষুম্না মধ্যস্থিতই বলেছেন। সকল মতানুসারেই সুষুম্নানাড়ীর বামভাগে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা নাড়ীর অবস্থিতি; এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ী। তন্ত্র মতে আবার সুষুম্নানাড়ীর অভ্যন্তরে "বজ্রিনীনাড়ী, তন্মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মতর চিত্রিনী নাড়ী রহিয়াছে। এই চিত্রিনী নাড়ীর মধ্যে মূলাধারস্থিত ষড়দলের মুখবিবর বা ব্রহ্মদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে [সহস্রারে] পরমশিব পর্যন্ত বিস্তৃত আর একটী নাড়ী আছে; এই নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলে। ...—সমুদয় চক্রই এই নাড়ীর গ্রন্থি স্বরূপ।" জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি এই নাড়ী পথেই সাধনার অন্তিম পর্যায়ে সহস্রারে উপনীত হয়ে পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হন। রাজযোগ এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রে কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বারোহণ সুষুম্না মার্গেই হয়ে থাকে বলে কথিত হয়েছে। এই আরোহনকালেই ষট্ চক্র ভেদ সাধিত হয়। ঊর্ধ্বগতি কুণ্ডলিনী শক্তি এইভাবে সুষুম্না (অথবা ব্রহ্মনাড়ী) পথে ঊর্ধ্বারোহণকালে নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বদিকে ক্রমপরম্পরায় দৈহিক এবং মানসিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক হন, এবং সাধক ক্রমে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এই সামগ্রিক নিষ্ক্রিয়তা অর্জিত হলেই কুণ্ডলিনী শক্তি আজ্ঞাচক্র (৬ষ্ঠ চক্র) ছেড়ে সহস্রারে প্রবেশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ঐ বিশেষ অবস্থায় "অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে (কুণ্ডলিনীতে) লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তত্ত্ব সমুদায় লোপ করিয়া, পরিশেষে সহস্রারে প্রকৃতি বা কুলকুণ্ডলিনী পরম শিবে (হংসে) সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহার সাম্যরস-সম্ভূত অমৃত ধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।"

এই হ'ল যোগ সাধনার তন্ত্র-ব্যাখ্যাত পরম প্রাপ্তি। সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে সাধনার এই চরম অবস্থায় সাধকের অন্তর্যামী জ্ঞানের সার্বিক সৃষ্টি হয় এবং সাধক সেই সময়ে একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি স্তরে বিরাজ করেন—যে অবস্থাকে কেহ বলেছেন অনাবিল আনন্দ, কেউ বলেছেন অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলে ভাসমান অবস্থা, আবার কেহ বলেছেন চিত্তবৃত্তির সার্বিক নিরোধ ফলে সর্ববিধ চিন্তা ভাবনা ও কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান অবস্থা।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির বেশীভাগই মহানির্বাণতন্ত্র হতে গৃহীত হয়েছে। কারণ তন্ত্র মাত্রেই কুলকুণ্ডলিনীর সর্বাধিক প্রাধান্য। কুলকুণ্ডলিনীই আদ্যা প্রকৃতি। সাম্যাবস্থাচ্যুত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় পুনঃপ্রবর্তন—মনে হয় এই হ'ল যোগ সাধনার অন্তিম লক্ষ্য। এবং এই চরম অবস্থার স্বরূপ বর্ণনার অতীত।

উপরিস্থ সমগ্র বক্তব্যের নির্যাসিত সারাংশ হচ্ছে যে সুষুম্না কাণ্ডের কিছুটা নীচে (শারীরতত্ত্বে যে স্থানটিকে Perineum বলে) বিশেষ কোন কোষগুচ্ছে সাধারণ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণ পুঞ্জীভূত শক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। এই কোষগুচ্ছ একটী অতিসূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রীদ্বারা সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। কোন উপায়ে ঐ নিষ্ক্রিয় শক্তি সক্রিয় হলে ঐ শক্তি প্রথমে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রীপথে এবং পরে সুষুম্নাকাণ্ডেরই নিম্নে

অংশ বাহিয়া উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়। অপ্রতিহিত গতিতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ পার হয়ে অবশেষে উপনীত হয় গুরুমস্তিষ্কে (cerebrum)। সেরেবরামে মস্তিষ্কের যে যে অংশ বা কেন্দ্রগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়াদি, ধী, মেধা, স্মৃতিপ্রভৃতি এবং চিন্তাভাবনা কল্পনাদির সঙ্গে সংযুক্ত, সেই সব অঞ্চল বা কেন্দ্রগুলিও পার হয়ে মস্তিষ্কের এমন একটি অঞ্চলে প্রবেশ করে যে অঞ্চলটি আদ্যাসৃষ্টিতে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে আসে না। উপরন্তু ঐ শক্তি সঞ্চরণকালে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে সমস্ত গ্রাহক চালক এবং চিন্তাভাবনা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ঐ শক্তির সংযোগ হয়, সে সমস্ত কেন্দ্রের কর্মক্ষমতা সাময়িক ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ একটি অতি বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সাধকের একতা অবর্ণনীয় অনুভূতি ঘটে।

এই নিবন্ধে লেখকের এই সমস্ত ঘটনাবলীর আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান প্রচেষ্টার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই, তার মনে একটি মাত্র বিনীত জিজ্ঞাসা: মানুষের মনে কুণ্ডলিনী কল্পনা উন্মেষ হল কিভাবে, তার ভিত্তি কি? বিশ্বাসী তথা জ্ঞানীগুণী জন অবশ্যই বলতে পারেন যে এ হল আগম শাস্ত্র, স্বয়ং মহেশ্বর মানব কল্যাণে এই জ্ঞান বিতরণ করেছেন এবং ঋষিদের মধ্যে কেউ ধ্যান যোগে সেই জ্ঞান আহরণ করেছেন। এটা হল আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা। লেখক কিন্তু একটা বস্তুতান্ত্রিক সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী এবং সেই আগ্রহের আতিশয্যেই সে একটা দুর্বিনীত কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছে।

অতি প্রাচীন প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির নানারূপ প্রকাশের সংস্পর্শে এসেছে। যেমন দিবারাত্রির আবর্তন, মেঘ বিদ্যুৎ বর্ষণ, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্তই ঘটেছে একটা স্থায়ী প্রেক্ষাপটে, যেটা পরে আকাশ নামে আখ্যাত হয়েছে। ঐ রকমই স্থায়ী অপর এক পটভূমি ছিল তার পায়ের নীচের মাটি অর্থাৎ পৃথিবী। সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে আকাশ ও পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, আকাশ সর্বক্ষণ পৃথিবীকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছে। ক্রমে তার অভিজ্ঞতা হল যে ঐ আকাশ থেকে বারি ঝরে পরেই পৃথিবী সিক্তিত হয় এবং ফলে ধরণী হয় শস্যপ্রসবিনী। এই অভিজ্ঞতাকে সে তার আপন জীবন যাত্রার সঙ্গে তুলনা করে একটা সমান্তরালতা লক্ষ্য করল, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, মানব সমাজেও আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিভূরা রয়েছে —পুরুষ হল আকাশ এবং নারী হল পৃথিবী। এবং এদুয়ের মিলনে নারী প্রসবিনী হয়, আসে নবজাতক, সার্থক হয় প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়—তাঁর সৃষ্টিরক্ষা।

নর নারীর নিগূঢ় মিলনের আবিষ্ট অনুভূতির মধ্য দিয়েই কি কুণ্ডলিনী কল্পনার উন্মেষ হয়েছিল মানবমনে? সুস্থ সবল নারীপুরুষের সপ্রেম সকাম সঙ্গমান্তে প্রায় অবর্ণনীয় যে আবেশের সৃষ্টি হয়, সেটিকে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে যোগী এবং মৈথুনের অন্য অবস্থার মধ্যে দুই ক্ষীণ হলেও একটা সাদৃশ্য লক্ষ না করে পারা যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যায়ে আসে একটা অন্তর-বাহ্য জ্ঞানকর্মহীন অবস্থা। যোগীগণ যা পান তাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ কেউ বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। তাই ব্যবহৃত হয়েছে অনির্দিষ্টবাচক শব্দ, যেমন অনির্বচনীয় বা অবর্ণনীয় ইত্যাদি। এক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এই ব্রহ্মানন্দকে সহস্রাধিক মৈথুনানন্দরূপে বর্ণনা করে মানবিক ধারণায় ধরতে চেয়েছেন।

এই থেকে কি এ দুয়ের মধ্যে অতি সামান্য হলেও একটা গুণগত ঐক্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? অবশ্যই তফাৎটা দুস্তর, কিন্তু মূলত পরিমাণগত মনে করা কি একান্তভাবে অসঙ্গত?

পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, মৈথুনকালে অন্তর্মুখী উদ্দীপনা আসে লিঙ্গস্থান থেকে এবং ঐ উদ্দীপক শক্তি লিঙ্গমূলের কোন বিশেষ আধারস্থ শক্তিকে উজ্জীবিত তথা উদ্দীপিত করে। এইরূপ ভাবনা প্রাচীন যুগের মানুষের পক্ষে যেহেতু অসম্ভব মনে করা সঙ্গত হবে কি?

সকল সঙ্গমান্তে যে সকল শারীরিক পরিবর্তন অনুভূত হয় তার যে একটা ঊর্ধ্বগামী পরম্পরা আছে তাও অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালের চিন্তাবিদ মনীষীগণ এটা অবশ্যই লক্ষ করে থাকবেন। সুতরাং কটিদেশের নিম্নভাগে একটা আধারে কোন শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান, মৈথুন ক্রিয়াদ্বারা তার উজ্জীবন এবং উদ্দীপন, উদ্দীপিত ঐ শক্তির কোনও বিশেষ পথে ঊর্দ্ধারোহণ এবং পরিশেষে সেই শক্তির প্রসাদে একটা অবর্ণনীয় অবস্থায় একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি ইত্যাদি ঘটনাবলীর মধ্যে একটা গূঢ় যোগাযোগ কল্পনা করা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়—পরন্তু এটাই স্বাভাবিক: এইরূপ কোন সিদ্ধান্তে কি তাঁরা উপনীত হয়েছিলেন?

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই তন্ত্রশাস্ত্রীয় পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার সাধনার কথা এসে পড়ে। 'মৈথুন' পঞ্চতত্ত্বের শেষতত্ত্ব এবং শেষতত্ত্ব সাধনার পথেই বিশিষ্ট তান্ত্রিকগণ সিদ্ধিলাভের সাধনা করেছেন। শিববাক্য হল, যাহা জীবগণের অতীব আনন্দকর, যাহা প্রাণীবর্গের সৃষ্টির হেতু এবং "যাহা আদি ও অন্ত রহিত এই মায়াময় জগতের মূল কারণ, তাহাই (শক্তিসঙ্গম) শেষতত্ত্ব জানিবে।"

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, "এইরূপে তত্ত্বসমূহ লয় করিয়া পরিশেষে সহস্রারে প্রকৃতি বা কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবে (ব্রহ্মে) সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্যসঞ্জাত অমৃতধারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে।"

এখানে 'সামরস্য' কথাটির অর্থ বা তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। অন্যমতে সামরস্য কথাটি 'সঙ্গম দ্বারা একীভবন' সূচিত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যোগপ্রক্রিয়ার অন্তক্ষণে কুলকুণ্ডলিনী সহস্রারে প্রবেশ করে পরম শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হলে যে অনির্বচনীয় আনন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটা সামরস্য সঞ্জাত। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চতত্ত্ব সাধনার অন্তেও যেমন সামরস্য, তার আদিতেও সেই সামরস্য, যদিও মানব মানবীর বেলায় সেটাকে 'মৈথুন' বলা হয়।

সুতরাং এটা মনে করা কি একান্ত অসঙ্গত হবে যে কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বের মূল অন্তত পরোক্ষভাবে মৈথুন তত্ত্বে নিহিত?

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে, ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটি কথা বলা অত্যাবশ্যক। তা হল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন যোগ গ্রন্থাদিতে, যেমন রাজযোগ, পাতঞ্জলদর্শন যোগ এমনকি দিব্যাচারী তান্ত্রিক যোগ সাধনায়ও মৈথুন তত্ত্বের কোনই স্থান নেই। বিভিন্ন পন্থায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

১। রাজযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ।

২। How to Know God (The Yoga Aphorisims of Patanjali)

৩। মহানির্বানতন্ত্রম্। (১ম-২য় খণ্ড)

চিঠিপত্র

মাননীয় মানবমন সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন, মানবমন বিশেষ অক্টোবর সংখ্যায় আমার লেখা নিবন্ধে 'আদিম অধিবাসীদের কথা'য় ভ্রম প্রমাদগুলি সংশোধন করে একটি তালিকা পাঠালাম। এটি দয়া করে পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত করে আমাকে বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে ইতি —

বিনীত
শুভদীয়া অরুণা হালদার
৬।১।৮২

শুদ্ধিপত্র

পৃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪২	কিরকেল-কমোমারেশন	কিরকেল কমেমোরেশন
২৪৩	পুরোভাস	পুরোডাস
২৪৩	অদৃশ্ত	দৃশ্ত
২৪৩	"অথবা কাক থেকে গিয়েছিল…"	'যাদ'
২৪৫	নেগ্রিটো	নেগ্রিটো
২৪৫	ঘরমের	ঘংমের
২৭৫	মূলত	মূলতঃ
২৪৭	বড়হম	বস্ত্ হম
২৪৫	সধর	সধব
২৪৬	ভিলমোলো	ভিলমোস (Vilmos)
২৪৬	মোর্ড ভন	মোর্ডাভিন
"	সিয়রেন	সিংমেন
"	লেনিনগ্রাদ	লেনিনগ্রাদ
"	বাবনডো	বালুডো
"	গ্রাকিবেসকী	এখনো গ্রাকিবেসকী
২৪৭	স্পাইরাক্টাইজেশন	স্পাইরাডিজেশন
"	ছাদাধিক	স্যাবাধিক
২৪৮	পৃত	পৃত্

"	মিত্‌ল্‌	মিত্‌ল্‌
"	ভিন্ন	ভিন্ন
"	কোংকু	কোবকু
"	গোও	গোও
"	দাক্ষিনী	দাক্ষিণী
২৪৯	"	"
"	"	"
"	কাড়	কাঁড়
২৫০	বুরবঙ্গ	বুড়াবঙ্গ
"	শিলাইগুলি	শিলাই
"	বাইরের	বাইরেও
২৫১	বিশ্বিয়	বিস্ময়
"	(কন্যা) ধনীর ছেলে	"(কন্যা) ধনীর ছেলে
	(তরুণ) দুজনার সাথী ইত্যাদি	দুজনার সাথী ইত্যাদি
২৫২	নাহেব	সাহেব
২৫৩	চিও	চিত্ত,
"	দৈত্যপতি	দৈত্যপতি
"	প্রশান্ত মহাসাগরীয়	প্রশান্ত মহাসাগরীয়
২৫৬	মিযক্‌	মিযঙ্‌
"	নাক্ত	নাঙ্‌
"	দক্ষিণারায়	দক্ষিণরায়
"	টিনায়	টিনায়
২৫৫	গদব	গদব
"	এনোয়	খ্‌মের
"	ক্যালিডোনীয়	ক্যালিডোনীয়
"	ডঃ বীরেন্দ্র চৌধুরী	ডঃ বীরেন্দ্রনাথ সাহা
২৫৬	অনুপ্রেরণায়	অনুপ্রেরণায়
"	বন্ত	বত

গণ্য

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাত্র-পাত্রী

ডাক্তার কর (৬০) মনোরোগ চিকিৎসক
শ্যামা (২৮) রোগিণী
বিকাশ (৩২) রোগিণীর ছোট ভাই—বামপন্থী রাজনৈতিককর্মী
প্রকাশ (৩৮) রোগিণীর বড় ভাই—পদস্থ অফিসার
শংকর (৩২) শ্যামার স্বামী—ইনজিনিয়ার
নন্দিতা (৩৫) শ্যামার ননদিনী (বিধবা)
সুখন লাল (২৮)—ডাক্তার করের সহকর্মী

ডাক্তারের চেম্বার

ডাক্তার : [কলিং বেল] মিসেস শ্যামা সরকার।

প্রকাশ : [পাশের ঘরের পর্দা ফাঁক করে উঁকি মারলেন] আসবো স্যার ?

ডাক্তার : এবার আসবেন মিসেস সরকার। আপনি কি মিসেস ?

প্রকাশ : আজ্ঞে না। আমি তার দাদা। আমিই তাকে নিয়ে এসেছি। আসতে পারি ?

ডাক্তার : ও : হো—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

[প্রকাশের প্রবেশ]

প্রকাশ : আমি শ্যামার দাদা !

ডাক্তার : হুঁ, বসুন। এক সেকেণ্ড। ডায়েরীটা কোথায় গেল ? আঃ ! ওঃ ! এই তো ! বলুন।

প্রকাশ : কাল ফোনে আপনাকে সবতো বলেছি।

ডাক্তার : আবার বলুন। ডায়েরীতে লিখতে হবে। হুঁ—নাম—শ্যামা সরকার। সেই ওষুধটা বাইরে এনেছেনতো ? বয়স—

প্রকাশ : বয়স ২৮ ; স্বামীর নাম শংকর সরকার।

ডাক্তার ; পেশা, ঠিকানা, কতদিন বিয়ে হয়েছে—বলে যান।

প্রকাশ : কালতো ফোনে—

ডাক্তার : আহা :···লিখেতো নিই নি। আবার বলতে হবে।

প্রকাশ : ঠিকানা ২৬ই দুর্গাশংকর সেন, কলকাতা-৪৯। বিয়ে হয়েছে ১ বছর ৮ মাস।

ডাক্তার : লাভ্ ম্যারেজ না নেগোসিয়েশন ম্যারেজ।

প্রকাশ : বলা চলে মিডিয়া ম্যারেজ বা করেসপনডেন্স ম্যারেজ ! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন থেকে বিয়ে হয়েছে।

ডাক্তার : হুঁ, বাচ্চা হয়েছে ?

প্রকাশ : বাচ্চা হয়েছে মাস ছয়ের আগে। তার পর থেকেই তো গণ্ডগোল।

ডাক্তার : গণ্ডগোল পরে শুনবো। আগে বলুন, আপনার নাম, ঠিকানা ? আপনি ফোন করলেন কেন ? আপনি নিয়ে এলেন কেন ? ওর স্বামী আসেন নি কেন ? ওর কোনো ইনটারেষ্ট নেই ? কেমন ?

প্রকাশ : কালইতো কোনে বললাম।

ডাক্তার : কতবার বলব—বাসী কথায় কাজ হয় না। প্রতি স্তির দিন চলে গেছে। লিখেতো রাখিনি। লেখাপড়ার ঝুগ এটা। বলুন—বলুন—।

প্রকাশ : শ্যামা বাচ্চাকে দেখছে না, দরোজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে। তাই শংকর মানে ওর স্বামী আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। বলেছেন, ওকে চিকিৎসা করাব দায়িত্ব এখন আমাদের। আমার নাম প্রকাশ রায়। টমসন অ্যাণ্ড টমসন-এর চাকরী করি। বাকি চেম্বারে।

ডাক্তার : হুঁ :। রোগীর কথা বলুন। এর আগে কোনোদিন এই ধরনের কোনো গোলমাল হয়েছিল কি?

প্রকাশ : না। খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে। বছর তিনেক আগে কিলজফিতে এম এ পাশ করেছে। পরীক্ষার ফলও ভাল করেছিল। আমরা দুই ভাই এক বোন। —ওই শ্যামাই সব থেকে ছোট; দুবই আদের যত্নে মানুষ হয়েছে। বাবা মারা গেছেন শ্যামার বিয়ের মাস-খানেকের মধ্যে। তখন ওরা শ্যামাকে মাত্র একদিনের জন্য পাঠিয়েছিল। তার পর থেকে শ্যামা আমাদের খবরাখবর নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা চিঠি দিলেও উত্তর পেতাম না। দেখা করতে গেলে ওকে একলা পাওয়ার উপায় ছিল না। ওর বিধবা ননদ সব সময় ওকে আগলে রাখতো। শ্যামা মুখ খুলতে চাইতো না। শুধু একটা কথা বলতো—ঘড়িটা বদলে দিও।

ডাঃ : ঘড়িটা—! কার ঘড়ি?

প্রকাশ : বিয়ের ঘড়ি। ওর বরের বোধ হয় ঘড়িটা পছন্দ হয়নি।

ডাঃ : ওর স্বামী কি কাজ করে?

প্রকাশ : ইঞ্জিনিয়ার। বাবাই পছন্দ করেছিলেন। তাঁর ছোট বেলার এক বন্ধুর ছেলে। শিবপুর থেকে পাশ করেছে। পাত্র হিসেবে ভালই বলে মনে হয়েছিল।

ডাঃ : এখন অপাত্র মনে হবার কারণ কি? [বাইরে গোলযোগ ও দরোজার শব্দ] হ্যাঁ আসতে পারো! কি খবর সুখন?

সুখন : এই যে—এঁর সংগেই এসেছে মেয়েটি। আপনিই-তো প্রকাশবাবু? আপনার বোনকে তো আর রাখা যাচ্ছে না। তার পাঠিয়ে দেব কি? দরোজা জানালা সব বন্ধ করে দিচ্ছে। অন্য রোগীরা ঘাবড়ে যাচ্ছে।

ডাঃ : প্রকাশবাবু আপনি যান। বোনকে নিয়ে আসুন। কেসটা কি সুখন?

সুখন : ডিজো বলেইতো মনে হচ্ছে। ডিলিউশন-অব পারসিকিউশন খুব জোরালো। পুলিশের ভয়ে দরোজা জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে আর ছদ্মবেশটা ঠিক আছে কিনা সবাইকে পরখ করাচ্ছে। প্যারানয়েড টাইপ।

ডাঃ : আচ্ছা তুমি যাও: ছদ্মবেশী এসে গেছে। ওর হিস্ট্রি শিটটা দিয়ে যাও। [ছদ্মবেশী শ্যামা ও প্রকাশবাবুর প্রবেশ ও সুখনের প্রস্থান : যাবার আগে শ্যামার রোগ ইতিহাসের শিটটা দিয়ে গেল]

ডাঃ : বসতো মা, মুখে ওটা কি লাগিয়েছ?

শ্যামা (ভয়ার্ত কণ্ঠে) : লাগাইনিতো কিছু, ওই রকমই-তো আমার মুখ। দাদাতো বলল, আমায় চেনা যাচ্ছে না। আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

ডাঃ : [হিস্ট্রি শিট পড়তে পড়তে] পারছি বইকি? নিশ্চয়ই পারছি।

শ্যামা : তাহলে কি হবে দাদা? পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যাবে! তুমি যে বললে ডাক্তারবাবু কিছুতেই ধরতে দেবেন না।

ডাঃ : কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না। আমার এখানে পুলিশের প্রবেশ নিষেধ! পুলিশের বড়কর্তারা সব আমার চেনা।

শ্যামা : দাদা সত্যি কথাই বলেছে তাহলে। কিন্তু ছোড়দার উচিত ছুটারেটা বদলে দেওয়া?

প্রকাশ : স্কুটারটার কি হয়েছে? বদলে দিতে হবে কেন?

শ্যামা : স্কুটারটায় খুব বেশি শব্দ হয়। ও বলেছে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

প্রকাশ : কে বলেছে? শংকর? স্কুটারটায় চেপেইতো আমার কাছে এসেছিল। কই কিছুতো বলল না।

শ্যামা : ওতো গাড়ী চেয়েছিল, তোমরা স্কুটার দিলে কেন? তাও আবার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

প্রকাশ : গাড়ী আবার চাইল কবে? গাড়ী চাইলে বাবা সম্বন্ধই করতেন না। অত টাকা তিনি পেতেন কোথায়?

শ্যামা : তোমারতো টাকা আছে। তুমিতো গাড়ী চড়। তাহলে ও চড়বে না কেন?

প্রকাশ : আমার কোথায়? গাড়িতো আমার কোম্পানীর।

শ্যামা : তোমার কোম্পানীকে বল ওকে একটা গাড়ী দিতে।

প্রকাশ : কি যা তা বলছিস? আমার কোম্পানী তোর বরকে গাড়ী দেবে কেন?

শ্যামা : তা না দিলে ওরা আমাকে ধরিয়ে দেবে। তোমরা ওকে ঠকিয়েছ? বাড়ি দাওনি, গাড়ী দাওনি, ঘড়ি দাওনি, টাকা দাওনি। এক কালো মেয়ে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ, সেও আমার কাজের ঢেঁকি। নিজের বাচ্চাটাকে পর্যন্ত দেখেনা। [সুর পালটে] আমি কি করব ডাক্তারবাবু? আমার বুকে যদি দুধ না থাকে আমি কি করে ছেলেটাকে দুধ দেব? দেখুন, আপনিতো ডাক্তার, দেখুন, সত্যিই দুধ নেই।

ডাঃ : (বেল টিপলেন) দেখাতে হবে না। আমি জানি সকলের দুধ থাকে না। তোমার কোনো দোষ নেই। [দ্বারপ্রান্তে সুখন] তুমি সিষ্টারকে পাঠিয়ে দাও। প্রকাশবাবু আপনি বাইরে যান।

শ্যামা : [চীৎকার করে উঠলো] না, সিষ্টার নয়। আমাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাবে! নন্দিতাদি ঠিকই বলেছিল।

ডা : কে নন্দিতাদি?

প্রকাশ : ওর ননদ। বিধবা। ওখানেই থাকে।

শ্যামা : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি চলে যাব। এখানে থাকব না। পাগলাগারদের চেয়ে লালবাজার অনেক ভাল—নন্দিতাদি বলেছে।

[যাবার উপক্রম]

ডাঃ : আরে কোথায় যাচ্ছ? বস, বস। লালবাজারও নয়, সুষ্মিনিও নয়। তুমি দাদার কাছে থাকবে। আমি তোমাকে ভাল করে দেব। বাচ্চাকে যাতে খাওয়াতে পারো, ঘুম পাড়াতে পারো, চান করাতে পারো সব ব্যবস্থা করে দেব। তাইতো সিষ্টারকে ডাকছিলাম। ও যে বাচ্চাদের সব কাজকর্ম জানে, তোমার মতন নতুন মায়েদের শেখায়।

শ্যামা : [আগ্রহ ভরে] তা হলে ও আমাকে ফিরিয়ে নেবে তো? হ্যাঁ ঠিক নেবে। আমি এখুনি ওকে চিঠি লিখছি। আমি কাজ শিখলে ঠিক ফিরিয়ে নেবে। জেলে দেবে না।

প্রকাশ : আমি বাইরে গিয়ে বলছি ডাঃ কর।

ডাঃ : হাঁ, আপনি বাইরে যান। সুখনকে পাঠিয়ে দিন।

শ্যামা : পুলিশ আসবে না তো? সিষ্টার আসবে না তো? তুমি যাও দাদা। ছোড়দাকে একটা নতুন ঘড়ি কিনে দিতে বল। তা হলেই আমাকে ওরা ফিরিয়ে নেবে। [প্রকাশ বেরিয়ে গেল]

ডাঃ : আচ্ছা, এইবার বল তো মা, ঘড়ি না স্কুটার—কোনটার জন্যে তোমার স্বামী রাগ করেছে [ছিট্টি সীট পড়তে পড়তে] সব কথা আমাকে খুলে বল। আমি সব ঠিক করে দেব।

শ্যামা : বারে। আমার স্বামী আবার রাগ করলো কবে? নন্দিতাদিই রাগ করল—আপনি আবার ওদের বলে দেবেন না তো? তা হলে ওরা ঠিক আমাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবে।

ডাঃ : তাই কি আমি বলি? (সুখন ঢুকল) তুমি তো সুখনকে সব বলেছ।

শ্যামা : বলেছি বুঝি। আমার তো মনে পড়ছে না।

সুখন : তুমি বললে না—নন্দিতা আর তোমার স্বামী—দুজনে মিলে বিয়ের পরদিনই দান সমগ্রী নিয়ে কত কি বলল। তোমার বাবা ওদের ঠকিয়েছে। তোমার ছোট ভাই চোরাবাজার থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড একটা বাজে ঘড়ি কিনে—

শ্যামা : কখন বললাম ? আমার তো মনে পড়ছে না। বাবাতো বাড়ী বাঁধা দিয়ে ওরা যা যা চেয়েছে সব দিয়েছে। তা না হলে কালো মেয়ে ওরা নেবে কেন ? আপনারাই বলুন।

ডাঃ : কালো হওয়াটা কি অপরাধ ? তুমি এত লেখা-পড়া শিখেছ, M-A.তে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছ। তুমি জানোনা দ্রৌপদী—যাকে নিয়ে এত বড় কুরুপাণ্ডবের লড়াই হয়ে গেল—তিনিও কালো ছিলেন।

শ্যামা : কিন্তু আমি যে কোনো কাজ জানিনা। বাচ্চাকে আমি দুধ দিই না। আমার জেল হবে, ছোড়দার জেল হবে। বাবা জেলে যাবার ভয়ে পালিয়ে গেছেন—মরেননি। ওরা তাই বলে। ওরা বলে—বাবা নাকি মরে ওদের ফাঁকি দিয়েছেন। আবার বলে—মরার নাম করে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন। আমি কিন্তু জানি বাবা মরে গেছে—বাবা মরে গেছে—আমাকে বিয়ের যৌতুক জোগাতে বাবা মারা গেছে। তবু ওরা বলে বাবা ওদের ফাঁকি দিয়েছে। ছোড়দা আসল ঘড়িটা—ওমেগাটা হাতিয়ে নিয়ে ওকে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গছিয়েছে। মরার সময় বাবা আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। ওরা আমাকে যেতে জানেনি। পুলিশের ভয় দেখিয়ে দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিল। আমি বলব। সব বলব। কিন্তু কিছু তো মনে পড়ছে না—সব ভুলে গেছি। আমি সব ভুলে যাচ্ছি—আমি সব ভুলে যাচ্ছি। দাদা—দাদা—(চীৎকার)

ডাঃ : সুখন—ওর দাদাকে ডাক। দাদা আসছে। তুমি সোফাটায় বস। এইবার সব মনে পড়বে। কোনো ভয় নেই। ওরা কেউ তোমার কথা শুনতে পাবে না। সোফাটার ওপর দেহটাকে এলিয়ে দাও। হ্যাঁ—এইবার তোমার সব মনে পড়বে। তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছ। চোখ বন্ধ কর। বলতো বিয়ের পরের ঘটনা। কেন তোমার ভয় ? এইবার মনে পড়ছে—

দৃশ্যান্তর

শংকরের বাড়ি

নন্দিতা : হ্যাগো বউমণি এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো ? এখনও কি শংকুকে চা-জলখাবার আমাকেই করে দিতে হবে ? আমি তো বাপু, চিরকাল এ ঝাঁটি আগলে পড়ে থাকব না।

শ্যামা : [লজ্জিত কণ্ঠে] আমি একবার ভোরে উঠে দেখলাম, উনি ঘুমুচ্ছেন। তাই আমিও—

নন্দিতা : তাই তুমিও—বাঃ বেশতো শিক্ষা পেয়েছ মায়ের কাছে। তখনই বলেছিলুম কটা পাশ করেছে—শুধু সেইটে দেখলে তো হবে না। আমাদের ছাপোষা ঘরের বউ, কাজকম্ম না করলে সে বউ দিয়ে আমাদের চলবে কি করে ? আমরা কি বউ-এর বিছে ধুয়ে জল খাব ?

শ্যামা : অনেক রাত অবধি জেগে—

নন্দিতা : নতুন বিয়ের পর অমন অনেকেই রাত অবধি জাগে, শংকুও জেগেছে। তার তো উঠতে দেরী হল না।

শ্যামা : কি করতে হবে দিদি বলুন—এখুনি আমি চটপট করে দিচ্ছি।

নন্দিতা : যাওতো উনুনটা ধরল কিনা দেখতো। ঝি বেটি আজ আসবে না। বাজার এসে পড়লো বলে। [শ্যামার প্রস্থান—শংকরের প্রবেশ] এতক্ষণে তোর এম্ এ পাশ করা বউএর ঘুম ভাঙলো। ধন্যি তোর পড়শ্ব। এম্ এ পাশ বউ না হলে চলবে না। মেয়েদের আবার বিদ্যে। সেই তো হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিয়োবে।

শংকর: তোর কথা না শুনে ঠকে গেছি দিদি। ঘড়িটা ওমেগা, ঠিকই, কিন্তু পুরনো। ওরা আমাকে ঠকিয়েছে।

নন্দিতা: বলিস কিরে? তা ঠিকই হয়েছে। তুই তো এম্ এ পাশ বউ চেয়েছিলি। রাজনগরের ওরা নগদ দিতে চাইলো তুই রাজি হলি না।

শংকর: তুই জানিস না, নগদ আজকাল কেউ চায়না। আইনে আটকায়।

নন্দিতা: রাখ তোর আইন। আমার বিয়েতে বাবার কাছ থেকে আমার শ্বশুর কম করে দশ হাজার আদায় করেছিল; তার সঙ্গে ২০ ভরি সোনা।

শম্ভু: তোদের সময় আইন ছিল না।

নন্দিতা: নগদ না নিলি, যৌতুক দিয়ে তো পুষিয়ে দেবে। তাইতো আমি ছিরিছাঁদের দিকে তাকাই নি। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে খুঁজেছিলাম।

শম্ভু: বাপের একমাত্র মেয়ে। ইউনিভারসিটিতে পড়িয়েছে। অনেক টাকা না থাকলে কেউ ইউনিভারসিটিতে পড়ায় না। তুই তো আমায় এই সব বোঝালি। সোনারপুরের সেই সোনার মত মেয়েটার তুই একশটা খুঁত বের করলি।

নন্দিতা: সুন্দরী মেয়েদের দেমাক খুব বেশি। সাজগোজ করতো আর সিনেমা দেখতো। আর আমাকে তোদের ঘরের হাড়ি ঠেলতে হতো চিরকাল—তাই তুই চেয়েছিলি।

শম্ভু: চেহারা ভাল না হলে কেমন কাজের হয় এখন দেখছিস্ তো?

নন্দিতা: রূপ না থাকলে মেয়েরা কাজ শিখবেই শিখবে। তাই তো আমি ভেবেছিলাম। এই যেমন আমি। তুইও ভুল করিছিস, আমিও ভুল করিছি। (রান্না ঘরের দিকে মুখ করে) ও—বউ, ও বউমণি! উনুন ধরলো কিনা দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি। তবে একেবারে ভুল করেছি বলব না। ছিরিছাঁদ নেই বলেই তো দাত চড়েও রা করে না। (নেপথ্যে)—যাই দিদি। উনুনটা নিভে যাচ্ছে। জ্বলছে না।) এ বউ নিয়ে তোর ঘর করতে হবে। [দরোজায় শব্দ] ওরে শম্ভু, কে ডাকছে তোকে দ্যাখতো।

[শংকরের প্রস্থান ও শ্যামার প্রবেশ]

এই যে বউরাণী এসেছেন দেখছি। তা চোখ লাল কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

শ্যামা: না দিদি। লাল হয়েছে উনুনের ধোঁয়ায়।

নন্দিনী: ভাত চাপিয়েছ? [শ্যামা চুপ] কি বাকরোধ হয়ে গেল দেখছি।

শ্যামা: উনুন ধরলো না, নিভে গেছে।

নন্দিনী: নিভিয়ে ফেলেছ বল! শংকরকে বলি হোটেলে গিয়ে খেতে। রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে তুমি যাও; শোও গিয়ে। বিছানাতো পাতাই আছে।

শ্যামা: আপনি? আপনার বুঝি আজ একাদশী। [দিদি দিদি বলে চেঁচাতে চেঁচাতে শংকরের প্রবেশ]

শংকর: জোচ্চোর! বুড়ো ঘুঘুটা এত ইতর, এত ছোটলোক হতে পারে ভাবতে পারিনি।

নন্দিনী: পগণ শাকরা এসেছিল বুঝি?

শংকর: তুই যা ভেবেছিলি তাই। ওজনে কম, খাদ বেশি। গয়নাগুলোও ঘড়িটার মতই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। চোরাবাজার থেকে কিনে পালিশ করে দিয়েছে? [দরোজায় শব্দ। নেপথ্যে—আসতে পারি] কে আবার জ্বালাতে এল! কে?

[নেপথ্যে—আমি বিকাশ]

শ্যামা: ছোড়দা এসেছে। ওর সামনে ও সব কথা তুলো না। প্লিজ! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। [প্রস্থান ও একটু পরেই বিকাশ ও শ্যামা আবার ঢুকলো নন্দিতা ভেতরের দিকে চলে গেল।]

বিকাশ: যাক তাহার দেখা মিলেছে তাহলে। ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। স্যুটকেসগুলো রেডি। কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে তাই জানতে এলাম। এবাড়ীতে? না তোমার নতুন ফ্ল্যাটে? ফ্ল্যাটটা

পেয়ে গেছ না এখনও দেরি আছে। [একটু থেমে] এ কিরে বাবা! যৌনব্রত পালন করার দিন নাকি আজ তোমাদের। চোখ লাল, মুখ থম থম; অথচ একটু আগেই তো চেল্লাচেল্লি করছিলে শংকর সাহেব?

শংকর : আর একটু ভদ্রভাবে কথা বললে কি পয়সা খরচ হবার সম্ভাবনা আছে?

বিকাশ : (বিস্মিত) ব্যাপার কি? নতুন কুটুমকে অভ্যর্থনার ধরনটাতো ভাল মনে হচ্ছে না। খুব ভদ্রভাবে এক পেয়ালা চা চাই যদি—

[নন্দিতার প্রবেশ]

নন্দিতা : দেরি হবে। বোনটিকে যদি উদ্ধার করতে, চা বানাতে সেখানে তাহলে চা পেতে দেরী হত না।

বিকাশ : আচ্ছা চা চাই না। বলুনতো কার্নিচারগুলো কোথায় পাঠাবো।

নন্দিতা : সে ঐ শংকর বলবে। বল শংকর।

শংকর : জাফরি কাঠের কার্নিচার রাখবার জায়গা আমার নেই।

বিকাশ : (উত্তপ্ত) এ-সব ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না। সোজা কথায় বল। কিরে শ্যামা, ধরোজা খুলে সেইযে মুখ ফিরিয়ে নিলি, আর যে মুখ ঘোরাচ্ছিসনা।

শ্যামা : ছোড়দা, তুমি বাড়ী যাও।

শংকর : তোমরা সব জিনিষে আমাকে ঠকিয়েছ। তাই তোমাদের কার্নিচার আমি চাই না।

বিকাশ : কি বলছ তুমি আবোল তাবোল! কি রে শ্যামা তুই চোখে কাপড় দিয়ে সরে পড়ছিস কেন? আমি এই অপমান সহ্য করে এখান থেকে যাচ্ছি না। কোথায়, কি ব্যাপারে আমরা তোদের ঠকিয়েছি— না জেনে এক পাও নড়ব না। এই বসলুম। (শক্ত হয়ে বসল)।

শ্যামা : (কান্না চাপতে চাপতে) তুমি যাও ছোড়দা যাও। এখানে থাকলে আরো কথা শুনতে হবে। তুমি যাও। [প্রস্থান]

শংকর : আমার আর দেরী করবার উপায় নেই। আমিও চললাম।

বিকাশ : যতক্ষণ না উত্তর পাচ্ছি একপাও নড়তে দেব না। আমাকে তুমি কিছু কিছু জানো শংকর। আমার কথার নড়চড় হয় না। এই দরজা আগলে দাঁড়ালাম।

নন্দিতা : তুমি কি মস্তানি করতে এসেছ। ওকে ছেড়ে দাও। তোমার পাগলকরা বোনের খোঁজতে ওকে আজ হোটেলে খেয়ে অফিসে যেতে হবে। ওকে যেতে দাও।

বিকাশ : আমার কথার উত্তর দিয়ে ও যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। [এগিয়ে গিয়ে কলার চেপে ধরে] বল, কে তোমাদের ঠকিয়েছে। কিসে তোমরা ঠকেছ।

শংকর : তোমার আস্পর্ধাতো কম নয়, আমার বাড়ী এসে আমার গায়ে হাত তুলছো। দিদি—জানালা দিয়ে বস্তির ওদের একবার হাঁক দেতো। বাড়ী এসে আমার কলার চেপে ধরেছে। রাস্কেল।

বিকাশ : শাট্ আপ্। আমার কথার উত্তর দাও। আপনিও তো মেয়ে দেখেছিলেন।

নন্দিতা : কনে না দেখে কি বিয়ে হয়? দেখেছিতো। একশোবার দেখবো। আমার বিয়ের আগে আমাকে ওরা দশ হকা দেখেছিল।

বিকাশ ; (শংকর গলা ছেড়ে) পছন্দ হয়েছিল—বলে তো ওদের বিয়ে দিয়েছিলেন।

শংকর : উঃ! গলাটা একেবারে ইয়ে করে দিয়েছে। আমি বলছি।

নন্দিতা : তুই থাম। আমি বলব। আমার বিয়ের পর কি নাকাল হতে হয়েছিল তা তোর ঐ বউ-এর দাদাকে জানিয়ে তবে ছাড়ব। শুনলে বুঝবে ওর বোন তো রাণীর হালে আছে।

শংকর : কী আবোল তাবোল বকছিস দিদি! চুপ কর।

নন্দিতা : তোর আর তোর সম্বন্ধির ভয়ে আমি চুপ করবো? আমাকে চুপ করাতে পারবে তোর ঐ গুণ্ডা সম্বন্ধি।

বিকাশ : যে হয় বলুন। মোটকথা, আমাকে সব কথা না বলে এঘর থেকে বেরুতে পারবে না কেউ।

নন্দিতা : বলবোই তো। জোর গলায় বলব। আমরা তোমার বিদ্যেধরী বোনের রূপ দেখে মুচ্ছো যাইনি। রূপের থেকে রূপোর দাম অনেক বেশি আমার ভাই জানে। তাই—

শংকর : তাই চুপ না করলে আমি এই দেয়ালে মাথা গুঁড়বো।

বিকাশ : রূপো সোনার কথা বিয়ের আগে ওঠেনি কেন? ভালমানুষের মত কেন বলেছিলেন—এই আপনিই তো—ছেলের গার্জিয়ান হয়ে বলেছিলেন, আপনাদের মেয়েকে আপনারা ভালবেসে যা দেবেন তাই—

নন্দিতা : রূপের ঘাটতিটা সোনারূপো দিয়ে পুষিয়ে দেবে—এটা আশা করেছিল আমার ভাই। কি অন্যায়টা সে করেছিল?

শংকর : দিদি তুই যদি চুপ না করিস তাহলে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো। বলব—বলব—তুই কি বলিছিলি?

নন্দিতা : তুই বলবি কি? আমিই বলছি? আমি তোর মত মেনিমুখো নয় যে ভয় পাব। হ্যাঁ বলেছিলাম—একমাত্র মেয়ে, ওরা ভদ্দর লোক, বাপ কলেজের মাষ্টার। দুটো যমদূতের মত ভাই। ওরা কি আর ঠকাবে?

বিকাশ : কিসে ঠকালাম?

নন্দিতা : বারে! আমরা যা আশা করলাম তা পেলাম না।

বিকাশ : আপনারা বুকের মধ্যে কি আশা লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা আপনাদের মনের ইন্ডারায় ডুব দিয়ে তুলতে পারব এমন বড় ঘরের ডুবুরি আমরা নই।

শংকর : তোমরা জানতে না ঘড়িটা সেকেণ্ড হাণ্ড—

নন্দিতা : তোমরা জানতে না তোমাদের বোনকে তোমরা গয়নার ওজনে ঠকিয়েছে।

শংকর : নোনা ধরা সোনা দিয়েছে—এই মাত্র শাঁকরা এসে বলে গেল।

নন্দিতা : সেকেণ্ড ক্লাস সোনা। তোমার বোন উনুনে আঁচ দিতে শেখেনি। থার্ড ক্লাসে পড়া মেয়েরা যা জানে।

শংকর : ঘুটার চাইনি।

নন্দিতা : এ্যামবাসাডার আশা করেছিলাম। কত বড় একটা ইঞ্জিনিয়ার।

শংকর : ঘুটারে করে 'দাইটে' গেলে, কনট্রাকটারদের কাছে মান থাকবে?

নন্দিতা : জিপে গেলে তারা যা দিতো—ঘুটারে গেলে তার অর্ধেকও দেবে না।

শংকর : কি হচ্ছে দিদি। বেফাঁস কথা বলছিস কেন?

নন্দিতা : আমাকে চোপ না রাঙিয়ে তোর বউকে চোপ রাঙাগে যা। সেই তো কাল বলছিল—ইঞ্জিনিয়াররা যে ঘেঁট পায় সে নাকি তা জানতোই না।

বিকাশ : উঃ। এত দেখে শুনে বাবা শেষ পর্যন্ত পাগলের বাড়ীতে বোনকে বিয়ে দিলেন। ওকে আমি এখনই নিয়ে যাব। শ্যামা। শ্যামা! তুই তৈরী হয়ে নে। আমি এখুনি গাড়ী নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান]

[শ্যামার প্রবেশ]

নন্দিতা : এই যে শ্যামা! তুমি পাগলা দাদার সঙ্গে সত্যি সত্যিই চললে নাকি?

শংকর : আমার কাছে যাওয়া আজ হবে না দেখছি। যেমন বোন তেমন ভাই।

শ্যামা : আমি বললাম না, ছোড়দার মেজাজ খারাপ। ছোড়দা পলিটিক্স করে। যৌতুক দেবার নাম শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। ওর জন্যে বিয়েটা

প্রায় কেঁচে যাচ্ছিল আর কি? ওকে আবার খোঁচাতে গেলে কেন?

শংকর : ও: মেজাজ যেন ওরই একলার খারাপ আমাদের মেজাজ বুঝি খারাপ হতে নেই?

নন্দিতা : বলি বউমণি, এ কদিনে তুমি এটা বোঝোনি যে তোমার দাদার চেয়ে আমার ভাইটি ওদিক দিয়ে কম যায় না। আবার মাটি কাটা কনট্রাক্টরি তার হাতে।

শংকর : আর বস্তির ছেলেগুলোর কথা বলছিস না যে? আমার এক ডাকে ওরা একশোজন এসে জড়ো হবে। তোমার দাদা আমার বাড়ী থেকে তোমাকে নিয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না?

নন্দিতা : কেন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবে বউমণি?

শংকর : আমি রেগে গেলে বাপের কুপুত্তুর। এই দিদিকে একবার ওর ভাশুর নিতে এসেছিল। সেদিন কী বলেছিলাম আমি—তোর মনে আছে তো দিদি?

নন্দিতা : খুব মনে আছে। হাড়ে হাড়ে তোকে চেনা হয়ে গেছে। তোর হবু সম্বন্ধিকে দিয়ে আমার অপমান করাবি বলে ভাশুরের সংগে যেতে দিসনি।

শংকর : একেবারে বাজে কথা। আমার রাস্তারো লোক ছিল না বলে তোকে যেতে দিইনি।

নন্দিতা : ভাশুর ও ঐ জন্যেই নিতে এসেছিল। বউ বাচ্চা পেটে নিয়ে বাপের বাড়ী গেছে বলেই না।

শংকর : তাই তো বলছি—সোহাগ দেখাতে নিতে আসেনি। আর এই যে বিকাশ বাবু এসেছে, ওর মতলব কি তাও আমি জানি। তুই ভাবনা বস্তির ছেলেগুলোকে। আমি ওর বোন নিয়ে পালানোর মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। ভারী মস্তান হয়েছেন।

শ্যামা : পাড়ার লোক জড়ো করে কেলেংকারি করবেন না। আপনার পায়ে পড়ি দিদি। ছোড়দাও দলে ভারি আছে। উসকে দিলে, কাল ওর দলবল নিয়ে যদি এ বাড়ী চড়াও করে—তখন?

নন্দিতা : ঠিকই বলেছে বউ। বস্তির ছেলেদের ডাকলে তারা আসবে ঠিকই কিন্তু তাদের খাই মেটাতে তুই ফতুর হয়ে যাবি, তোর জান চলে যাবে।

শংকর : মানের থেকে জান বড় নয়। সেকেণ্ড হাণ্ড মাল দিয়ে ঠকাবে, তার ওপর চোখ রাঙাবে। আবার গাড়ী ভাঙতে গেছে—সব এই শ্যামার জন্যে। মান ইজ্জত সব—যাক নিয়ে যাক। বয়ে গেল। আপদ যাক। [বিকাশের প্রবেশ] নিয়ে যাও তোমার বোনকে। নেই মাংতা।

শ্যামা : আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি সব কাজ শিখে নেব। বাবাকে বলে নতুন ঘড়ি—

বিকাশ : কি বললি? তুই যাবি না। নতুন ঘড়ি। বাবা যেটা দিয়েছেন সেটা পুরণো? তুইও এই সব বলছিস। চাইনা তোকে নিয়ে যেতে। আমি চলে যাচ্ছি। ফার্দিচার বেচে দিচ্ছি। তবে এই চামারদের একবার দেখে নেবো।

শংকর : মুখ সামলে কথা বল। কাড়ে বংশে যারা জোচ্চোর তারা কিনা আমাকে চামার বলে? আমি পুলিশে ডায়েরী করতে যাচ্ছি। সেকেণ্ড হাণ্ড মাল নতুন বলে চালিয়েছ? চিটিং আর ট্রেসপাস—দুটো চার্জে তোমাদের নামে মামলা আনবো।

বিকাশ : বিয়ে করে পণ নিয়েছ, তার পর আবার আর একটা বিয়ে করার জন্যে বউ তাড়াচ্ছ। তোমার নামেও আমি মামলা ঠুকবো। তার আগে আমার পণনিবারণী সভার সভ্যদের নিয়ে এসে তোমার বাড়ীর সামনে সত্যাগ্রহ করব। দেখি কে আটকায়। মনে থাকে যেন শ্যামা। এরা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেও আমাদের বাড়ীতে তোর জায়গা হবে না। [নেপথ্যে শংকর দা / শংকর দা তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে লোক এসেছে। শীগগির বাইরে এস।]

শংকর : যাচ্ছি। [প্রস্থান]

বিকাশ : কি ব্যাপার ? বাবার কিছু হল নাকি ? দেখি তো [প্রস্থান, সংগে সংগে শ্যামারও। একটু পরেই শ্যামার পুনঃপ্রবেশ]

শ্যামা : বাবার হার্ট এ্যাটাক্। ম্যাসিভ্ এ্যাটাক্। আমি যাব। ছোড়দা দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি—[শংকর ফিরে এল] শুগো দাদাকে একটু দাঁড়াতে বল। আমি কাপড়টা বদলিয়েই আসছি।

শংকর : এখন গিয়ে আর কি হবে? এতক্ষণ টিকে আছেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া তোমার দাদা চলে গেছে। [একটা গাড়ী চলে যাওয়ার শব্দ]

শ্যামা : এঁ্যা—কি বলছ। বাবা গো—এরা আমায় যেতে দিচ্ছে না। আটকে রেখেছে। আমাকে নিয়ে যা ছোড়দা। আমাকে— (রোদনে ভেঙ্গে পড়ল)

দৃশ্যান্তর

ডাক্তারের চেম্বার

[শ্যামা উঠে সোফায় বসেছে। এখনও চোখে মুখে আতংকের আভাস। ডাক্তার, সুখন ও প্রকাশ]

শ্যামা : আমি তো শুনলাম। পুলিশের হুমকি। বাবা ঠকাতে চাননি ওরা বিশ্বাস করছে না। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, ওরা ঠিক ধরবে। ওকে যতদিন ধরতে না পারছে, আমাকে নিয়ে হাজতে রাখবে। তাইতো বড়দার বাড়ীতে আমাকে লুকিয়ে রেখে গেছে। ছোড়দাকেও ধরবে।

ডাঃ কর : তোমাকে কেন পুলিশ ধরবে।

শ্যামা : কতবার বলব এক কথা। বাবা ছোড়দা সবাই মিলে আমাকে ঠকিয়েছে। দিদিও তাই বলছেন। স্বামীও তাই বলেছে। পাড়ার সবাই বলছে। ছেলেটা আমার জানলে তাকেও ধরবে। তাইতো আমি ওর ধারে কাছে ঘেসছিনা।

ডাঃ : তোমাকে ধরবে না। তুমি তো ঠকাওনি। তোমাকেইতো দাদারা ঠকিয়েছে বলছ!

শ্যামা : কেন ঠকাবে আমাকে? আমার কি বাবার সম্পত্তিতে ভাগ নেই ? (ক্রমশ উত্তেজিত)

ডাঃ : তোমাকে দাদারা ঠকায়নি। তোমার বাবা ঘড়িটা আগে থেকে কিনে রেখেছিলেন তাঁর চেনা এক দোকান থেকে। এখনতো বিদেশী ঘড়ি খুব কম পাওয়া যায়। তাই তিনি আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছিলেন। তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।

প্রকাশ : একথাতো আমি ওকে কাল কতবার বলেছি। ও বিশ্বাস করছে না। আর বাবার মৃত্যুর দিন এত কাণ্ড করে এসেছিল বিকাশ—তাও আমাকে ওরা জানায়নি।

শ্যামা : তাহলে ওরা আমাকে নেবে না কেন ? পুলিশ আমাকে ধরবে বলছে কেন ? বলছে আমার নাকি মাথার গোলমাল হয়েছে। ডাক্তারবাবু, আপনি ওকে বলুন না—আমি ঠিক আছি।

ডাঃ : তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, বাচ্চাটাকে দেখছ না। তোমার মন্মিতাদি শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে। এখন গিয়ে কি তুমি সংসারের ভার নিতে পারবে ? পারবেনা। বরং দাদার এখানে দিনকতক বিশ্রাম করে একেবারে সুস্থ হয়ে স্বামীর কাছে যেও, কেমন ! যাও। ওষুধগুলো নিয়মিত খাবে। প্রকাশবাবু ঠিক মত নিয়ে আসবেন।

শ্যামা : না ; আমি বড়দার ওখানে যাবনা। বউদি-ও ওদের মত আমাকে পাগল বলে। আমি যাব না।

ডাঃ : প্রকাশ বাবু, ও ঠিক বলছে কি ?

[সুখনের প্রবেশ] সুখন আর কজন বাকী ?

সুখন : রিপোর্ট ছিল। আমি নোট নিয়েছি।

ডাঃ : শ্যামার বউদি কি বলেছিলেন মনে আছে তোমার ?

সুখন : প্রকাশবাবুর স্ত্রী বলছিলেন শ্যামা নাকি ছোটবেলা থেকেই কিছুটা অস্বাভাবিক। বাবার অতিরিক্ত আদরে ও নষ্ট হয়ে গেছে। ভীতু, জেদি, নির্কর্মা, কারোর সংগে মেশেনা। বর স্নেহতো দূরের কথা,

ইউনিভারসিটি বা কলেজে ওর কোনো মেয়ে বন্ধুও ছিল না। কলেজ আর বাড়ী—এর বাইরে ও কিছুই জানতো না, চিনতো না। খুব সিমপ্যাথেটিক মনে হল না ওকে।

ডাঃ : সত্যি নাকি প্রকাশবাবু, তা হলেতো শ্যামাকে অন্য জায়গায় রাখা দরকার।

প্রকাশ : আমার স্ত্রী কিছুটা বাড়িয়ে বলেছে। ঠাণ্ডা নিরীহ গোবেচারী হয়েই তো শ্যামা মুস্কিলে পড়েছে। সত্যিই ওকে এ যুগের মেয়ে বলেই মনে হয় না। আপনারা যাকে মর্ণকাম না কি বলেন,—ও হচ্ছে সেই জাতের।

শ্যামা : ডানলপে পিসির বাড়ীতে থাকব। ওখানে পুলিশ ফাঁড়ি নেই। [টেলিফোন বেজে উঠলো। সুখেন গিয়ে কথা বলতে লাগল]

প্রকাশ : পিসীমা কিছু জানেন না, সেখানে—

সুখেন : স্যার, মেয়েটির স্বামী আপনার সংগে কথা বলতে চান। কি বলব ?

শ্যামা : আমায় নিতে আসছে বোধ হয়। বলে দেবেন তো ডাক্তারবাবু, আমি ভাল হয়ে গেছি। না না, আমি যাব না। ডাক্তারবাবু আপনি ওকে আসতে দেবেন না। নতুন ঘড়ি আর গাড়ি না পেলে ওরা আমাকে ঠিক জেলে দেবে। আমার দাদারা তো আমাকে ঠকিয়েছে। আমাকে জেলে পাঠাবার মতলব করেই আমাকে ঠকিয়েছে। তাহলে বাবার সম্পত্তিতে আমায় ভাগ দিতে হবে না। নন্দিতাদি ঠিকই বলেছে। পুলিশের কাছে সব বলে দেব।

ডাঃ কর : সুখেন, ছেলেটাকে আসতে বল। প্রকাশবাবু বোনকে নিয়ে আপনি পাশের ঘরে একটু বসুন।

শ্যামা : জানলা দরোজা সব বন্ধ আছে তো। ওরা সব দিকে নজর রেখেছে।

সুখেন : সব ঠিক আছে। আপনার দাদা একজন বড়দরের অফিসার। ভয় কি ? পাঁচ মিনিটের মধ্যে শংকরবাবু আসছেন, তার। চলুন প্রকাশবাবু, ঘরটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

[তিনজনের প্রস্থান]

ডাঃ কর : তুমি ওদের রেখেই ফিরে এস ! [বিকাশের প্রবেশ] তুমি আবার কেন্থে ? দরোজায় একটা টোকা পর্যন্ত না দিয়ে হট করে ঘরে ঢুকে পড়লে ? কি চাই তোমার ?

বিকাশ : আমার দাদা, বোন আপনার এখানে আমাকে আসতে বলেছিলেন ?

ডাঃ : তোমার দাদা বোন ? কে তারা ? কি নাম তাদের। তারা যত বড় দরের লোকই হোন না কেন, তুমি হট করে একটা ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকতে পারো না। যাও বেরিয়ে যাও। এখুনি বেরিয়ে যাও। যেমন হট করে ঢুকেছ, তেমনি হট করে ভেগে পড়।

বিকাশ। [চেয়ারে বসে] ভেগে পড়বো বলে আসিনি। আমি জানতে চাই আপনি আমার বোনকে কি দেখেছেন—মাপ করবেন। সত্যিই আমার টোকা দিয়ে, আসতে পারি বলে, ঢোকা উচিত ছিল। শ্যামার নয়, আমারই দেখছি মাথার গোলমাল হয়েছে। সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে। আই য়্যাম সরি।

ডাঃ : তুমি শ্যামার দাদা—ছোড়দা—বিকাশ !

বিকাশ : আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন। ওদের কাছ থেকে আমার কথা শুনেছেন বোধ হয়। আমি জানতে চাই—

ডাঃ : শ্যামা সত্যিই অসুস্থ কি না ? এইতো ?

বিকাশ : আমার ধারণা শংকর, আই মিন ওর স্বামী আর আমার বউদি ওকে পাগল বানাতে চায়।

ডাঃ : তাদের স্বার্থ কি তোমার বোনকে পাগল বানিয়ে।

বিকাশ : আর একটা মেয়ের বোঝা বাপের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। আমার বাবা আমাদের না জানিয়ে বাড়ী মর্টগেজ রেখে শ্যামার বিয়ের যৌতুক যুগিয়ে

কতুর হয়ে হার্ট কেল করেছেন। বাড়ী ছাড়তে হবে জেনে মারও হার্ট এ্যাটক হয়েছে। তাকে নার্সিং হোমে রেখে আসতে গিয়েই আমার দেরী হয়ে গেল। শ্যামাকে ও বড়দাকে খবরটা এখনও জানাইনি।

ডাঃ : জানাবার দরকারও নেই। শ্যামার অবস্থা তাতে আরো খারাপ হবে।

বিকাশ : আপনি বলতে চান শ্যামা সত্যিই অসুস্থ! মানে, তার মাথার গোলমাল হয়েছে।

ডাঃ : আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বাস না হলে তুমি অন্য ডাক্তারের অভিমত নিতে পারো।

বিকাশ : দরকার নেই। সব ডাক্তারই ঐ এক কথাই বলবে আমি জানি। আমি আপনার অসম্মান না করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই? অবশ্য যদি অনুমতি দেন।

ডাঃ : অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পার।

বিকাশ : মাথার গোলমাল মানে পাগলামি! জিনিষটা কি?—আমাকে বলতে পারেন?

ডাঃ : ডাক্তারী বই বা এনসাইক্লোপডিয়া খুলে দেখে নিয়ে আমার কাছে আসলে ভাল করতে।

বিকাশ : সেবা আমার আছে।

ডাঃ : তাহলে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ কেন?

বিকাশ : খুব বিশেষ প্রয়োজনেই আসতে হয়েছে। যদি অসুস্থ হয়েই থাকে মনে করেন, কেন হয়েছে সেটা বলতে হবে। আমি পণপ্রথা নিবারণী সংস্থার সম্পাদক। আপনাকে লিখে দিতে হবে পণপ্রথাই তার অসুস্থতার জন্য দায়ী।

ডাঃ : তুমি তো আচ্ছা ছেলে দেখছি। আমি তোমার কথামত লিখে দিতে যাব কেন?

বিকাশ : কেন? কারণ আপনি একজন মানুষ। কারণ আপনি চিকিৎসক। কারণ আপনি এই সমাজের লোক এবং সমাজের কল্যাণ চান।

ডাঃ : মানুষ—কিন্তু বয়স্ক মানুষ। বুঝে সুঝে চলি। যা তা লিখতে পারব না।

বিকাশ : তাহলে লিখে দিন, ও অসুস্থ নয়।

ডাঃ : তাই বা লিখতে যাব কেন? আমি জানি ও অসুস্থ। তোমার কথায় তাহা মিথ্যে কথা লিখতে হবে?

বিকাশ : ও যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, কেন অসুস্থ হয়েছে সে তো আপনিই বলবেন। আমি তার দাদা। আপনি আমাকে কারণ জানাতে বাধ্য।

ডাঃ : না। আমি জানাতে বাধ্য নই। সুধন, সুধন—

[সুধনের প্রবেশ]

এই ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে যাও এখুনি! কী আস্পর্ধা! আমাকে চোখ রাঙায়!

বিকাশ : আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে কে? আসুক তো দেখি। আমি আমার বোনের অসুখের কারণ না জেনে এক পাও নড়বো না।

সুধন : আরে বিকাশ যে। তুই গাঁক গাঁক করে চিল্লাচ্ছিস কেন? স্যার-এর মুখের ওপর চোটপাট। তুই কি ওঁকে চিনিস না? ডাঃ কর—

বিকাশ : [একটু ধতমত খেয়ে] সুধন, তুই এখানে জুটলি কবে থেকে। ইনিই ডাঃ কর? মানে বি. ডি. কর? যিনি তখন সুদেবের চিকিৎসা করেছিলেন।

সুধন : হ্যাঁ।

বিকাশ। মাফ করবেন স্যার। আমার মাথার ঠিক ছিল না। সুধন, তুই নিশ্চয়ই আমার বোন শ্যামাকে দেখেছিস। সে কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে?

সুধন : শ্যামা তোর বোন? হ্যাঁ, তবে ভাল হয়ে যাবে আশা করছি।

বিকাশ : পণযোর এক স্বামীর পাল্লায় পড়েছিল। যদি পাগল হয়ে থাকে তার স্বামীর অত্যাচারেই হয়েছে। আমি ডাঃ করের কাছে এইটে লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। ঐ রাসকেলটাকে আমি—

সুধন : তুই একটা উল্লুক। তার কি সেটা লিখে দিতে পারেন। পুরো ইনভেস্টিগেশনই এখনো হয়নি। এক তরফা শুনে, কিছুক্ষণ দেখে, কি কারণে অসুখ হয়েছে—সে কি কেউ বলতে পারে। তোর রগচটা ভাবটা আগের মতই আছে দেখছি।

বিকাশ : আমার বোনের কোনো অসুখ ছিল না। বিয়ের পর—

সুধেন : হিস্ট্রি আমরা শুনিছি। তুই আগে তারের কাছে মাফ চেয়ে নে, তারপর এ নিয়ে আলোচনা হবে।

বিকাশ : আমি সত্যিই দুঃখিত ডাঃ কর।

ডাঃ কর : নেভার মাইণ্ড। তোমাদের যুগের ছেলেদের মগজে উত্তেজক পদার্থের আধিক্য বেশি। এ রকম আকছারই হচ্ছে। তাছাড়া আমার বয়সে আবার নিস্তেজক পদার্থের ঘাটতি ঘটে, তাই দেখা হলেই সংঘর্ষ। নেভার মাইণ্ড। সুধন, তুমি পাশের ঘরে নিয়ে ওকে দাদার কাছে রেখে এস। আর একটা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হও। অপরপক্ষ এলেন বলে। ঐতো বেল বাজছে। (কলিং বেলের শব্দ) বিকাশ তুমি ঐ ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। সুধন, যাও ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। [নির্দেশ মত বিকাশ ও সুধেনের প্রস্থান। ডাঃ কর তাঁর চেয়ারে বসে কাগজ পত্রে মনোনিবেশ করলেন। সুধন শংকরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।]

সুধন : ইনি শংকরবাবু, টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। [শংকর সামনের চেয়ারে বসল]

ডাঃ : বলুন, কি আপনার প্রয়োজন।

শংকর : আপনি কি রকম দেখছেন আমার স্ত্রীকে—

ডাঃ : কে আপনার স্ত্রী ? নাম বলুন।

শংকর : টেলিফোনে বলেছি তো—

ডাঃ : আবার বলুন। রোজ পঞ্চাশটা কোন এ্যাটেণ্ড করতে হয়। এই বয়সে সবার কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।

শংকর : নাম শ্যামা—

ডাঃ : (ডায়েরী দেখতে দেখতে) হ্যাঁ, তা আপনিই স্বামী শংকরবাবু। বাঃ বাঃ। খুব বীরপুরুষ তো ?

শংকর : কি বলছেন ঠিক বুঝলাম না।

ডাঃ : স্ত্রীকে ভয় দেখাতে পারেন, আর তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসতে ভয় পান ?

শংকর : ভয় পাব কেন ? আর আমি স্ত্রীকে ভয় দেখাতে যাবই বা কেন ?

ডাঃ : তাকে ভয় দেখাননি ? এক বছর ধরে রোজ তাকে শোনাননি যে তার বাপভাই তাকে ঠকিয়েছে, তারা ঠক জোচ্চোর ?

শংকর : ওরা যে জোচ্চোর, সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

ডাঃ : আর ওরা যদি হলপ করে বলে আপনি মনোযৌতুক পাননি বলে স্ত্রীকে নানাভাবে নির্যাতন করেছেন, আর তার ফলে সে পাগল হয়ে গেছে।

শংকর : বাজে কথা বললেই তো হল না। প্রমাণ কোথায় ?

ডাঃ : আপনাকে ওরা ঠকিয়েছে তারই বা প্রমাণ কোথায় ?

শংকর : ওর বাবা বলেছিল, নতুন ওমেগা ঘড়ি দেবে, আমার কাজের জায়গায় যাতায়াতের জন্যে ভাল বন্দোবস্ত করে দেবে, জামাই সাক্ষী দেবে।

ডাঃ : নগদ টাকাও চেয়েছিলেন আপনি।

শংকর : কখখনো না। আমি কিছুই চাইনি। ওরাই বেচে আমার হাতে পায়ে ধরে বাজে একটা মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

ডাঃ : আর তার বদলে ঘুস দিয়েছে হাজার পঁচিশেক টাকা, বাড়ী বন্ধক দিয়ে।

শংকর : ঘুস ! বলুন কম্পেনসেশন !

ডাঃ : কিসের কম্পেনসেশন ?

শংকর : রূপ গুণের অভাবের।

ডাঃ : বটে! এই রকম কমপেনশেসন ঠিকাদারদের কাছে নেওয়া অভ্যেস আছে জেনেই বোধ হয় মেয়ের বাপ আপনাকে পাকড়াও করেছিলেন।

শংকর : দেখুন স্যার, আপনার কাছে আমি চিকিৎসা করাতে আসিনি। ও ধরনের কথা আর একবার বললে আমি কিন্তু লজ্জা করব না।

ডাঃ : (উত্তেজিত) আমি হাজারবার বলব। তোমার বোনই শ্যামার ভাইকে বলেছে। তুমি যে ডেট নিতে অভ্যস্ত - সে কথা শ্যামাকেও বলেছ ; ডোণ্ট টক্ রাবিশ, আমার নষ্ট করার মত সময় নেই। বল, কি জন্য আমার কাছে এসেছো।

শংকর : জানতে এসেছি যে শ্যামা বিয়ের আগেও কি আপনার চিকিৎসায় ছিল? মানে, ওর মাথার গোলমালটা কতদিনের!

ডাঃ : এই জন্যে? তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়। গেট আউট, গেট আউট—আই সে।

শংকর : চটছেন কেন স্যার? আপনাকে উপযুক্ত ফিজ দেব। বলেন তো স্পেশাল কমসালটেশন ফিজও দিতে পারি। তুই-তোকারি করবেন না।

ডাঃ : (চীৎকার করে) এখুনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও —নইলে

শংকর : আপনি তো পেশাদার স্যার। টাকা দিতে চাইছি—আপনি 'ওপিনিয়ন' দেবেন না কেন? আপনার সঙ্গে 'কনসালটেশনের রাইট' আমার নিশ্চয়ই আছে।

ডাঃ : অর্থলোভী পিশাচ! ওকে তাড়িয়ে আর একটা বিয়ে করে আরো কিছু টাকা মারতে চাও। বিকাশ ঠিকই বুঝেছে। ইউ আর এ ক্রিমিনাল। তোমাদের চাবকানো উচিত।

শংকর : আমাকে কে চাবকাবে শুনি? গুণ্ডা পুষেছেন নাকি? [বিকাশ ঘরে ঢুকে কলার চেপে ধরল]

বিকাশ : আমি চাবকাব। তার আগে ঘুষিযোগের ধাক্কা সামলাও। ইউ স্কাউণ্ড্রেল টু হেল—[একটা ঘুসি মারল। শংকর টলতে টলতে চেয়ার ধরে সামলে নিল]

ডাঃ : আহাঃ। কি হচ্ছে বিকাশ। থাম। থাম। [এক দরোজা দিয়ে সুধন ও অন্য দিক দিয়ে প্রকাশ ঢুকে পড়ল]

শংকর : গুণ্ডা পুষে কারবার চালাচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। বেশ! বেশ! আচ্ছা, এর শোধ যদি না নিতে পারি তবে আমি—

বিকাশ : চুপ! আর একটি কথা বললে আর একটা 'আলি ব্র্যাণ্ড' জাব বাড়ব।

প্রকাশ : বিকাশ, এসব কি হচ্ছে? তুই ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুললি? আমাদের বংশের নাম ডোবালি?

বিকাশ : বংশের নাম রাখবার জন্যে তো তোমার মত মোটা মাইনের অফিসার রয়েছে। আমাকে বংশ-তালিকা থেকে বাদ দিতে পারো।

সুধন : বিকাশ, গোয়ার্তুমি থামা। স্যার, গোলমাল শুনে শ্যামা ভয় পেয়ে ব্যালকনি থেকে লাফ দিতে গিয়েছিল। সিষ্টার ওকে কলো করে ধরে না ফেললে সাংঘাতিক কাণ্ড হত। [সেপথে শ্যামার চীৎকার ছেড়ে দাও, আমাকে এ্যারেষ্ট করো না। নতুন ঘড়ি দেবে দাদা]

ডাঃ : চল—চল তো দেখে আসি। হাঁ, তুমি এখুনি একটা লারপাকটিল—[পুরুষের মত কাপড় পরে শ্যামা ঢুকে পড়ল]

শ্যামা : ছোড়দা, ঘড়ি এনেছিস। বড়দা - তুমি স্যুটারটা নিয়ে তোমার গাড়িটা আমাদের দিয়ে যাও। [হঠাৎ শংকরের দিকে নজর পড়ল] আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি আমাকে নিয়ে চল। পুলিশকে বলে যাও, আমার দাদারা তোমাকে ওমেগা আর এ্যামবাসাডার দেবে। তারা জোচ্চোর নয়। বোনকে ঠকাবে না। আমারোতো বাড়ীতে একটা অংশ আছে। ওরা তোমাকে টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়?

শংকর : আমি কবে আবার ওমেগা, এ্যাবাসাডার চেয়েছি ? যত সব পাগলামী। [প্রস্থানের চেষ্টা]

শ্যামা : ওকি ? তুমি আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছ কেন ? ডাক্তারবাবুকে জিগ্‌গেস কর—আমি ভাল হয়ে গেছি। আমাকে পাগলাগারদে রেখে যেও না। তোমার পায়ে পড়ি !—[শংকরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল]

বিকাশ : তুই ওর সংগে ওই ক্লাউডেস্টটার সংগে কোথায় যাবি ? তোকে নিংড়ে আর রোপারস নেবে না ও জানে।

প্রকাশ : দিনকয়েক আমাদের কাছে থাক। ডাক্তারবাবু বললেই আমি তোকে শংকরের কাছে দিয়ে আসবো।

শ্যামা : ডাক্তারবাবুতো আমাকে যেতে বললেন—তাইনা ডাক্তারবাবু। আমি সিষ্টারের কাছ থেকে সব লিখে নিয়েছি। আমি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারব, ঘুম পাড়তে পারব, জামাকাপড় পরাতে পারব। আমি সব পারব। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। কেমন—[শংকরের হাত ধরে টানল]

শংকর : আমি তোমাকে এখানে আনিনি ; নিয়ে যেতেও পারব না। তোমার দাদাই নিয়ে এসেছেন, তিনিই তোমাকে নিয়ে যাবেন। [যাবার চেষ্টা]

শ্যামা : না, আমাকে তুমিই এনেছ। তুমিই নিয়ে যাবে। তুমিই দাদাকে বলেছ, আমি পাগল।

শংকর : আমি তোমাকে নিতে পারব না। তোমার দাদা তোমার ভার নিয়েছেন।

শ্যামা : [তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] তাহলে আমার বাচ্চা ফেরত দাও।

শংকর : বাচ্চাতো তোমার কাছে, তোমার দাদা প্রকাশ-বাবুর বাড়ীতে।

শ্যামা : তুমি বাচ্চাকে এনে দাও। ওরা চোর, ওরা জোচ্চোর' আমার বাচ্চাকে ওদের কাছে রাখব না।

শংকর : কি ডাক্তার সাহেব, শুনছেন তো। বোন কি বলছে। ভাইদের সম্পর্কে ওর কি উঁচু ধারণা শুনছেন তো। আর আমি ঐ কথা বলতে, আপনি মার-মুখো হয়ে উঠলেন। এখন কি বলবেন।

ডাঃ : কি ধড়িবাজ এই ছোকরা। কি দুঃসাহস এই ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের। শয়তানের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছে। মেয়েটার দুর্বল মস্তিষ্ক দিনরাত আতংকের অভিভাবন ঢুকিয়ে ওকে পাগল করেছে। ইয়েস ইউ আর রাইট, বিকাশ। শুধু পাগলই করেনি, তোমাদের সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ শুনিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছে। ওকে সাজা দেবার কোনো ব্যবস্থাই বোধ হয় পিনাল কোডে নেই।

সুধন : আমরা আদালতে একথাতো বলতে পারি যে ওর আর ওর বোনের অত্যাচারে শ্যামা পাগল হয়ে গেছে।

শ্যামা : আমি পাগল হইনি ডাক্তারবাবু। ও আমাকে ভালবাসে, ওতো কোনো অত্যাচার করেনি। দাদারাই আমার বাচ্চাকে আটকে রেখেছে।

শংকর : কি ডাক্তার সাহেব, শুনলেনতো ! আমার বিরুদ্ধে আপনাদের মতলব হাসিল করতে পারবেন না। উল্টে আপনারাই ফ্যাসাদে পড়বেন। হয়তো বেরিয়ে পড়বে ওদের বাড়ীর অসুস্থ পরিবেশেই ও বিয়ের আগেই অসুস্থ হয়েছিল।

বিকাশ : এ লোকটা বলে কি ? ওকে আমি একেবারে শেষ করব—[গলার টুঁটি চেপে ধরতে গেল, সুধন ও প্রকাশ বাধা দিল, ওকে জাপটে ধরল। অন্যদিকে শ্যামা শংকরকে আড়াল করে দাঁড়ালো]

সুধন : বিকাশ, বোকার মত কাজ করো না, ওকে ছাড়।

প্রকাশ : একটা খুনোখুনি করে পুলিশ আদালত করতে চাস নাকি ? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে বিকাশ। আরে থাম ! থাম !

সুধন : প্লিজ। বিকাশ।

শ্যামা : [কান্নার সুরে] না, না, ওকে মারতে দেব না। বাবা অনেক টাকা দিয়ে ওকে আমার জন্যে

কিনেছেন। ওকে তোমরা খুন করলে আমার অনেক টাকা লোকসান হবে। আমাকে দেখবে কে? ছোড়দা—চলে যা। চলে যা। এখান থেকে চলে যা। এটা আমাদের ফ্ল্যাট। বাবা আমাদের কিনে দিয়েছেন। সল্টলেক সেকটর থ্রিতে আমার নামে এই ফ্ল্যাটটা বুক করা হয়েছিল। তাই না? বাবা তুমি ওদের বকে দাও তো। তুমি বিয়ের আগে আমাকে বলেছিলে না সলটলেকে একটা ফ্ল্যাট চেয়েছে জামাই? আমি কিনেছি। তোর কাছে কাগজপত্রগুলো রেখে দে। কই গো—তাখাওনা ওদের কাগজ পত্তর। আমরা পজেশন পেয়েছি। তোমরা এবাড়ী ছেড়ে চলে যাও।

শংকর: একেবারে পাগল হয়ে গেছে দেখছি।

শ্যামা: (এবার পাগলের মত ফেপে গিয়ে) তুমি মিথ্যুক, তুমি প্রতারক। আমার নামে ফ্লাট কিনেছ বলে তুমি ধাপ্পা দিয়েছ; ও টাকাতো বাবা দিয়েছে। (গলার স্বর ভারাক্রান্ত) অই তো বাবা। বাবাগো, তুমি কথা বলছ না কেন। দাদাদের ভয়ে। ওরা তোমার কিছু করতে পারবে না। বড়দা, ছোড়দা—তোমরা বাবাকে কিছু বলছ না ছেন? বাবা বাড়ী বেচে আমার বিয়ে দিয়েছে বলে তোমরা রাগ করেছ? আমিও কি কম রাগ করেছিলাম। কত বোঝালাম, কত বললাম। বাবা, বিয়ে না করলে কি হয়? দাদারা যদি খেতে না দ্যায়? আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছো, আমি মাষ্টারি করে নিজের খরচা চালাতে পারব না? ঠিক পারব। কেন তুমি বাড়ী বেচলে দিলে? কেন তুমি অই লোকটার (শংকরের দিকে তাকিয়ে) লোভের আগুনে আমাকে আহুতি দিলে, নিজেকে আহুতি দিলে। ওকে আমি যে কিছুতেই ভালবাসতে পারছি না। ওর গায়ে বুনোশুয়োরের গন্ধ—। ওকে মানুষ মনে করার অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। ওর ছেলেকে গর্ভে ধরেছি বলে ছেলেটাকেও ভালবাসতে পারছি না। ওকেও রক্তচোষা বাদুড় ছানা বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটাকে আমি ওর বাবার মত ঘৃণা করি। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও বাবা। পাগলা গারদে থাকব না। নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—(এর মধ্যে কয়েকবার ডাক্তারের চাপা গলার কণ্ঠ শোনা যাবে; ওকে বাধা দিও না, না, না। ধরো না; কথা বলতে দাও। লেট হার স্পিক আউট।

ডাঃ: (ব্যস্ত ও উত্তেজিত) সুবন ওকে দেখো কর। ব্যালকনির দিকে যাচ্ছে। আবার ঝাঁপ দিতে পারে। কুইক্, কুইক। হায়রে! মেয়েরা এদেশে শুধু নয়, সব দেশেই কমোডিটি—পণ্য। অথচ মজার কথা কি জানেন—বিয়ের বাজারে ওরা কিন্তু বিক্রেয় না—ওদের জন্যেই পণ দিতে হয়।

[মেয়ের কথাগুলো বলবেন এগিয়ে এসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে]

[সকলে ষ্টেজের উপর স্থির নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। একটা বিপদ-সঙ্কেত সুরে সাইরেন বাজতে লাগল। তার মধ্যে শোনা গেল কে যেন ভেতর থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছে]

নারী একদিকে যেমন বর্তমান সভ্যতার এক অতি মূল্যবান পণ্য, অন্যদিকে আবার আমাদের দেশে বিয়ের বাজারে নারীর কোনো মূল্য নেই: বস্ত্রালংকারে সজ্জিত করে রজতকাঞ্চনের দক্ষিণা দিয়ে তাকে দান করতে হয়।

বিবাহ ও পরিবার মূলত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। শিশু ও স্থবিরদের খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্য

থেকে বৈবাহিক ও পারিবারিক সংগঠন ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন যে আমাদের পরিচিত পিতৃপ্রধান বিবাহপ্রথা পুরুষজাতি কর্তৃক সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকরণের উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত। বৈবাহিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সমাজের অর্থনীতি ও উৎপাদান প্রথার উপর নির্ভরশীল। বিবাহ ও পরিবার সমাজের অনুভাব ও অঙ্গ বিশেষ। সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবার সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি, সমাজ বৃহৎ পরিবার নয়।

আধুনিক পিতৃপ্রধান সমাজে আজও স্বামী কর্তৃক সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত। স্ত্রীর ক্রয়, বিক্রয় ও দান করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অধিকার আজ অতীত বর্বরযুগের কথা, তবে মোটামুটি সে যুগের অনেক প্রথার বিবর্তিত সূক্ষ্মরূপ আজও বিদ্যমান।

সাময়িকী

সবচেয়ে দীর্ঘজীবী কারা ?

ট্রান্সককেসাসের আরমেনিয়ায় জনসংখ্যা তিরিশ-লক্ষের মতো। তাদের মধ্যে ৬,৫০০ জন ৯০তম জন্মদিবস পালন করেছেন। আর ৬২৫ জনেরও বেশির বয়স একশোর বেশি। অতএব এখানেই স্থাপিত হবে বার্ধক্যবিজ্ঞান কেন্দ্র যার কাজ মানুষের দীর্ঘায়ু লাভের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন আরমেনিয়ার বার্ধক্যবিজ্ঞান সোসাইটির সভাপতি এবং আরমেনিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমির জীবরসায়ন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা গুরগেন আপুরিকিয়ান।

●

"দীর্ঘজীবী" কথাটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারব যে ঘটনার সঙ্গে এই কথাটির কোনো মিল নেই। কেননা দীর্ঘজীবীরা বাঁচে স্বাভাবিকভাবে যতো বছর তাদের বাঁচার কথা ততো বছর। অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষ বাঁচে দীর্ঘায়ুদের আয়ুর অর্ধেক কালও নয়।

আরমেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান ও অন্যান্য ককেসীয় প্রজাতন্ত্র হচ্ছে, বলা যেতে পারে, "দীর্ঘায়ুলাভের কেন্দ্র"। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়, সারা বিশ্বের। সুনিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে পার্বত্য এলাকার মানুষরাই সবচেয়ে দীর্ঘকাল বাঁচে। কথাটা খাটে সাধারণভাবে সমস্ত পর্বত সম্পর্কে নয়; শুধু কেন্দ্রীয় পর্বতবলয় সম্পর্কে যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০ থেকে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত। কারণ বিশেষ করে এই উচ্চতাতেই অতিবেগুনী সৌর বিকিরণের প্রাচুর্য থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরো একটি ব্যাপার—সবসময়ে হেঁটেচলে বেড়ানো। পর্বতের মানুষকে সবসময়ই চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয় —ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক। আর এই ব্যাপারটি সম্পন্ন করতে হয় পেশী বাতাসে। সমতলের চেয়ে পর্বতে অক্সিজেন কম থাকে। অল্প অক্সিজেনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে পর্বতের মানুষেরা হয়ে ওঠে প্রয়সহিষ্ণু (বৃদ্ধ বয়সের পয়লা নম্বরের শত্রু হচ্ছে অক্সিজেনের অল্পতুলতা)।

পার্বত্য এলাকায় অতিরিক্ত ওজনের মানুষ কখনো দেখা যায় না। পর্বত অতিরিক্ত ওজনের মানুষের স্থান নয়। পর্বত যেন বলছে: দীর্ঘায়ু হও ও ছিপছিপে থাকো। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে লম্বা রাস্তা হাঁটা—এই হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন ও রক্ত সঞ্চালন মন্থরীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার সেরা উপায়। উপরন্তু হেঁটে চলে বেড়ালে প্রাণশক্তি ও প্রফুল্লতা পাওয়া যায়। পর্বতের ভূ-দৃশ্যের সৌন্দর্য, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক, মানুষের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষের মনে সদর্থক

ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। এই সমস্ত কিছুর ফলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায় ও স্নায়ুগত চাপ কমে।

আমি আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। তা হচ্ছে ঘুম—বিশ্রামলাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঘুম ছাড়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করা অসম্ভব। আমাদের এই যুগে যখন স্নায়ু ও মনের ওপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে—ঘুমের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর্বতের অধিবাসীদের ঘুম হয়ে থাকে অতি গাঢ় এবং তারা দিনে দশঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমোয়। তা ছাড়া বছরে সাত-আট মাস তারা ঘুমোয় খোলা আকাশের নিচে।

পর্বতের অধিবাসীদের খাদ্যে থাকে প্রচুর ভিটামিন। তাদের খাদ্যে থাকে রান্না-না-করা শাকসব্জি, সবুজ তরিতরকারি, রসুন, বীন, আঙুর, মধু ও এমন সব অন্যান্য খাদ্য যাতে আছে প্রচুর জৈব সক্রিয় পদার্থ। পর্বতের অধিবাসীদের মধ্যে বহু প্রাচীন একটি অভ্যাস প্রচলিত আছে—তা হচ্ছে হালকা আঙুরের সুরা পান। এটি টনিকের কাজ করে। সুরা চর্বি ভাঙে ও রক্তকে উজ্জীবিত করে (বৃদ্ধবয়সে রক্তের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে যায়)। কাজ সম্পর্কে বলা চলে, পর্বতের মানুষরা জন্ম থেকেই বুঝতে পারে জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছন্দ। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, জীবন যতো ছন্দময় হয়, ততো বেশি একঘেয়েমি কাটে এবং ততো বেশি দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা চলে যাকে বলা হয় 'অবসরপ্রাপ্তের জড়তা'। বৃদ্ধ মানুষদের বেলায় এ এক সর্বনাশা ব্যাপার। বার্ধক্যবিজ্ঞানীরা এই কথাটি অনেক কাল আগেই বুঝেছেন যে জীবনের এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে রূপান্তরণটি হওয়া চাই মসৃণ। আকস্মিক পরিবর্তন অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া চাই, আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে ও পরিবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার অনুভূতি থেকে বিষণ্ণতা জন্মায়।

গ্রামে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে অবসর নেওয়ার প্রচলিত জীবনধারা থেকে খুব বড়ো একটা পরিবর্তন হয় না। যৌথখামারের ক্ষেতে কাজ করার বদলে তারা তখন কাজ করতে থাকে নিজের বাড়ির আঙিনার ক্ষেতে বা বাগানে। কিংবা সে নাতিনাতনীদের ভার নেয় (দীর্ঘজীবীদের নাতিনাতনীদের সংখ্যা প্রচুর হয়ে থাকে)। তাছাড়া, গ্রামের দিকে দেখা যায়, বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রতি একটা শ্রদ্ধার বোধ থাকে এবং অল্পবয়স্করা তাদের পরামর্শ নিতে আসে।

সম্প্রতিকালে দীর্ঘজীবন লাভের ক্ষেত্রে বংশগত হেতুটি নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কোনো কোনো বার্ধক্য-বিজ্ঞানী মনে করেন, এটাই প্রধান হেতু। কিন্তু, এক্ষেত্রে অনেক প্রহেলিকাও আছে। সবকিছুই কি বংশানুক্রমে অর্জিত? মানিয়ে চলার ব্যাপারটি? বার্ধক্য বিলম্বিত হওয়াটাও কি বংশগত? মানিয়ে চলার ক্ষমতা কি আমরা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাই, না, জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেরাই অর্জন করি? দীর্ঘায়ু হবার বাসনা—তাও কি বংশগত? রমাঁ্যা রলার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। তিনি হাঁপানিতে ভুগতেন এবং দুর্বল ফুসফুস নিয়ে নিঃশ্বাসের কষ্ট পেতেন। তবুও তিনি আশিবছর বেঁচেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় মানুষের ইচ্ছার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

আরো একটি কথা আছে। দীর্ঘ জীবনের জন্য চাই উচ্চ লক্ষ। সাধারণভাবে লক্ষ করা যায়, অলস বা আত্মকেন্দ্রী ব্যক্তি কখনো দীর্ঘকাল বাঁচে না।

সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য

গল্প শোনা যায়, সম্রাট নিরোর পত্নী পপীয়া গাধার দুধ দিয়ে মুখ ধুতেন। এমনকি সেই প্রাচীন কালেও একথা জানা ছিল যে প্রসাধনের কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রসাধনের মধ্যে জৈবগত সক্রিয় পদার্থ কী কী আছে—তাদের ওপরে। জৈবগত সক্রিয় পদার্থ হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হত চর্বি ও তেল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিলাদের জন্য নানারকমের ক্রীম (চামড়ায় লাগাবার জন্য) পাওয়া যায়। ডাক্তারদের সুপারিশ অনুযায়ী এই ক্রীমগুলো তৈরী করা হয়েছে। ক্রীমগুলোতে যোগ করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত কিছু মলম—মধু, লতাপাতা, গুলঞ্চ, স্বাভাবিক বন ও বিভিন্ন উদ্ভিদের নির্যাস। তার ফলে সোভিয়েতে তৈরী ক্রীম যেমন হয়েছে আরামদায়ক, তেমনি ভেষজ গুণসম্পন্ন করাটা সোভিয়েত প্রসাধনবিদ্যার সাধারণ অঙ্গীভূত। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি সোভিয়েত ক্রীমের নাম উল্লেখ করা চলে। যেমন, সুভেজেই (সজীবতা), ভিক্তোরিয়া (ভিক্টোরিয়া ক্রীম), তোমাংনি (টমাটো ক্রীম)। এগুলোতে আছে দশ শতাংশ স্বাভাবিক রস। 'ভেচের' (রাত্রি) ক্রীমে আছে পার্সলি লতার নির্যাস।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্প্রতি প্রস্তুত হচ্ছে তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া মহিলাদের জন্য দলপ্রস্থ ভেষজ ক্রীম। যেমন, 'একভেল' (এলিউথেরোকক্কাস সমন্বিত), লেমনগ্রাস নিম্ফা' (অরণ্য পত্নী, চীনা লতা সিন্‌সেঙের নির্যাস সমন্বিত), এবং 'এলিজিয়া' (এলিজি)। এই ক্রীমগুলোর সাহায্যে চামড়ার পরিচর্যা খুব ভালোভাবে করা চলে। শেষোক্ত ক্রীমটি ব্যবহার করলে বয়সের লক্ষণ চাপা পড়ে, সকল চর্ম লাভ করে তরুণ চর্মের গুণাবলী—চর্ম হয়ে ওঠে মসৃণ, নরম ও তাজা ; চর্ম আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে ও কমনীয় হয়ে ওঠে। বয়সের লক্ষণ নিরোধক এই ক্রীমে আছে স্বাভাবিক তেল এবং ভিটামিন এ. ই ও এফ।

প্রসাধনের ব্যবহার গত কয়েক বছরে বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসাধন-উৎপাদনকারী শিল্পও সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৭০ সালে প্রসাধন-উৎপাদনকারী উদ্যোগগুলিতে (মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও তাসখন্দের বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগ থেকে সুভোড ও কালানোর ছোট ছোট কারখানা পর্যন্ত) উৎপন্ন হত ১৩,৩০,০০,০০০ প্রকারের প্রসাধন ও সুগন্ধি। আর গত বছরে উৎপন্ন হয়েছে ২০০ কোটি প্রকারের।

মস্কোর প্রসাধনতত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রত্যেকটি রকমের প্রসাধন খুঁটিনাটিরূপে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই সেটির উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়। নতুন কোনো প্রসাধন উপস্থিত করা হলে পরীক্ষা করে দেখা হয় তাতে এ্যালার্জি হয় কিনা এবং চর্মের ক্রিয়াগত গঠন এবং জীবদেহের জৈবরসায়নগত প্রক্রিয়া কোনোভাবে ক্ষুণ্ন হয় কিনা। নতুন ক্রীম বা নতুন লিপস্টিক প্রথম ব্যবহার করতে হয় পরীক্ষাধীন জীবদের ওপর।

প্রত্যেকেই বোঝেন যে ভালো চামড়ার জন্য চাই প্রসাধন ছাড়াও আরও কিছু। প্রয়োজন চামড়া

পুষ্ট করা এবং চামড়ার গভগোল দূর করা—শুধু চামড়ার খুঁতগুলোকে ঢাকা দিলেই চলে না।" একথা বলেছেন ফরাসী সংস্থা লোকোমেক্স্‌ট-এর প্রধান ডাক্তার ধানুভা ত্রেমুক্তি। তার মতামতকে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা খুবই মূল্য দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেছেন; "আমি জানি, স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত খনিজের ভিত্তিতে প্রস্তুত ক্রীমের কদর আপনাদের দেশে সব সময়েই আছে। সোভিয়েতের ক্রীম খুবই ভালো। তার আছে ভেষজ গুণ। সোভিয়েতের ক্রীম ফ্রান্সেও এখন জনপ্রিয় হয়েছে।"

প্রসাধন সম্পর্কে মনোভাব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে। প্রাচীন রাশিয়ার মেয়েরা সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করত কাঁচা রঙ—সাদা সীসে ও রুজ সহযোগে মুখে লাগাত প্রচুর রঙ, ভুরুতে লাগাত গাঢ় প্রসাধন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রসাধনের সৌন্দর্য ও ব্যবহার সম্পর্কে মনোভাব ছিল খানিকটা অনুগ্র। তবে ১৯৩০-এর দশকে প্রসাধন পুনরায় মহিলাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ফরাসীরা বলে, তোমার চেহারা বা কিসার ঠিক রাখো, মুখ তো বানিয়ে নেওয়া চলে। "মুখ বানিয়ে নিতে দিবে" প্রত্যেক মহিলা নিজস্ব রুচির পরিচয় দিতে থাকে—প্রচলিত ধারার সঙ্গে তাল রেখে তার নিজস্বতাকে বাড়িয়ে তোলে। আজকের প্রচলিত ধারা হচ্ছে স্বাভাবিকতা ও সরলতা বজায় রাখা। প্রসাধন এমনভাবে করতে হবে যেন কোনো কৃত্রিমতা ফুটে না ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নিত্যই নতুন নতুন প্রসাধন দ্রব্য উদ্ভাবিত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে সোভিয়েত প্রসাধন-উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিতে ৭০টিরও অধিক প্রকারের প্রসাধন উৎপন্ন হয়েছে। তাদের উপাদান নির্ধারণ করেছে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুগন্ধী দ্রব্য সম্পর্কিত সারা ইউনিয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট। যেমন, ভুরু ও চোখের পাতার রঙ 'সুরোমকা' (সৌবাদি) ব্যবহার করলে চোখের পাতা পুরু ও দীর্ঘ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টও হয়। পাইন ও ফার গাছের নির্যাস যোগ করা হয় যাতে ঠোঁট শুকিয়ে না যায়। আর মুখের রুজ একদিকে যেমন চামড়ায় মনোমতো রঙ আনে, অন্যদিকে চামড়াকে বাতাস থেকে রক্ষা করে।

এমনিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসাধন-উৎপাদনকারী শিল্পে এমন সমস্ত কিছুই উৎপন্ন হয়েছে যা দিয়ে মহিলাদের সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী দেখায়।

প্রাচীন কাহিনীতে শোনা যায় রাজকন্যা আরসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলতো আরসি, সত্যি করে বলো, এই জগতে সবচেয়ে সুন্দরী কে?'

আধুনিক একজন মহিলা, যে এই সমস্ত প্রসাধন ব্যবহার করে, সে নিশ্চয়ই শুনবে আরসি জবাব দিচ্ছে, 'তুমি ছাড়া আর কে।'

চৌম্বক সম্পাদনের সাহায্যে নিরাময়

বাইলোরাশিয়ার বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাকার্য থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে, জীবদেহে জীবন্ত টিস্যুর ওপরে স্বল্পকালীন উচ্চশক্তিসম্পন্ন চৌম্বক স্পন্দনের নিরাময়কারী ক্রিয়া ঘটে থাকে।

চৌম্বক স্পন্দন উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র বিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেছেন সেটি আকারে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সের চেয়ে সামান্য বড়ো। একটি সোলেনয়েড হাতের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ও যন্ত্রটি চালু করা হয়। সামান্য একটু চিন-চিন করে ওঠার মতো একটা অনুভূতি হয় রোগীর। যন্ত্রটি চালু থাকে স্বয়ংক্রিয় ধরনে। স্পন্দনগুলো একটির পর একটি উপস্থিত হতে থাকে কড়াকড়ি নির্ধারিত হারে।

জীবন্ত জীবদেহে স্থায়ী চুম্বকের ক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই অবহিত। তবে স্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্রের বেলায় ব্যাপারটা এই ঘটে যে নিউট্রনগুলো অনেকটা যেন দোলায়মান অবস্থায় থাকে, তাদের গতি ত্বরণপ্রাপ্ত হয় না। স্পন্দন ক্রিয়াশীল হয় আরও সার্থকভাবে এবং শারীরিক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও উজ্জীবিত করে তোলে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারটিকে কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং প্রমাণ পেয়েছেন যে এই নতুন স্পন্দন-জাতীয় শারীরচিকিৎসায় যথার্থই ফললাভ হয়।

দন্ত-চিকিৎসকের ভূরপুন যন্ত্রণা উপশম করে

য়ুক্রাইনের অগ্রসর মেডিকেল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কর্মীরা নতুন এক যন্ত্রণা-নিরোধক নির্মাণ করেছেন। মেডিকেল ভেষজ ও অতিক্ষুদ্র পদার্থ একসঙ্গে পিষে করে ছোট ছোট চাকতি তৈরি হয়। তারপর দন্ত-চিকিৎসকের ভূরপুনের সাহায্যে সেই চাকতি প্রয়োগ করা হয় দাঁতের শক্ত টিস্যুর ওপরে। ফলে দাঁতের উপরিতলে একটি পর্দা তৈরি হয়ে যায়। এই পর্দা দাঁতকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি দাঁতের রোগও সারায়।

প্রাক্‌কালীন প্রয়োগের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। দন্ত-ঘর্ষণের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শল্য-চিকিৎসা শুরু করার আগে চিকিৎসকরা নতুন এই যন্ত্রণা-নিরোধক প্রয়োগ করে থাকেন। এই যন্ত্রণা-নিরোধকের সঙ্গে ফ্লুরিন যোগ করা হয়। তার ফলে দাঁতের ক্ষয় ঘটতে পারে না।

শীতল নিরাময়

য়ুক্রাইনের ওদেসায় যোগোদ্‌যাপ উৎপাদন সমিতিতে একটি যন্ত্রের উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই যন্ত্র দিয়ে জীবাণুমুক্ত বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে পোড়া ঘা সারানো চলবে। মস্কোর চিকিৎসালয়গুলিতে এই যন্ত্রের সাফল্যমণ্ডিত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং মেডিকেল যন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এই যন্ত্র পুরস্কৃত হয়েছে। যন্ত্রটি ব্যবহার করলে যন্ত্রণাদায়ক ড্রেসিং ব্যতিরেকেই রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

নিজের মস্তিষ্ক কি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়

মানুষের কথা বলা ও বিমূর্ত চিন্তা করার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় বাম গুরুমস্তিষ্ক থেকে। যে সব

যাদের বাম গুরুমস্তিষ্কের তৎপরতা অস্বাভাবিক হয়ে থাকে তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দক্ষতা হ্রাস পায়। লাভিয়ার মনঃসমীক্ষাবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। একই সঙ্গে, প্রতিচ্ছবি চেনার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যে ডান গুরুমস্তিষ্ক, তার ওপরে যথেষ্ট চাপ থাকে না। বিজ্ঞানীদের মতে, এটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যত্ন-ব্যবহৃত ভাণ্ডার। মস্তিষ্কের এক অর্ধাংশের ওপরে অস্বাভাবিক চাপ থাকার ফলে অন্য অর্ধাংশে ঘাটতি সৃষ্টি করে।

এ-বিষয় ডঃ ক্রাউফলিস যে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন তা থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, মানুষ নিজের মস্তিষ্কের অংশগুলিকে উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আধুনিক পাঠক্রমে দর্শনানুসারী সাজসরঞ্জামের ভূমিকা প্রভূত বৃদ্ধি করা দরকার। অপারেটর, ডেসপ্যাচার, ইত্যাদি ধরণের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা উচিত কেবলমাত্র অক্ষর ও সংখ্যার মাধ্যমে নয়, রঙ ও চিত্রের মাধ্যমেও।

(কলকাতার সোভিয়েত ইনফরমেশনের সৌজন্যে

With best compliments from :

M/s. Bharat Tin & Enamel Co. (P) Ltd.

Manufacturers of 16·5 Kgs of Tin Containers
& Enamel Wares.

Telephone : 44-2234, 44-0069

5A, ROBINSON STREET,
CALCUTTA-17

With Best Wishes from :

BEGRAJ AGARWALA

TEA PLANTER

সংবাদপত্র সমাজদর্পণ হয়ে উঠুক

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংবাদপত্রের দুশো বছরের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। পরাধীন দেশে দেশব্রতী সম্পাদক ও সংবাদিকরা স্বাধীনচিন্তা, নির্ভিকতা ও দেশপ্রেমের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসেরই অঙ্গ। অর্থদণ্ড, প্রচাররহিত, সম্পাদক ও মুদ্রকের কারাদণ্ড, প্রাক সেন্সরশিপ ইত্যাদি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার চেয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করতে। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা সফল হয়নি। বাংলার নবজাগরণের ধারাতেই সংবাদপত্রের আবির্ভাব, আবার সংবাদপত্র চিন্তার স্বাধীনতা, মানবিকতা ও সমাজপ্রগতির জন্যও সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের রক্ত, ঘাম, অশ্রুর অনেক ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়।

দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। সম্পদশালী শ্রেণীর পক্ষে বৃহৎ সংবাদ পত্রের ভূমিকা স্বাধীন দেশের জনগণের অগ্রগতির পথে অচলায়তন সৃষ্টি করেছে। জাতীয় স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং জনশিক্ষার দায়িত্বকে অস্বীকার করে তারা কায়েমী স্বার্থের আশ্রয় ও স্থিতাবস্থাকেই আঁকড়ে থাকতে চাইছে। বৃহৎ সংবাদপত্র এখন সমাজদর্পণের চরিত্র হারিয়ে তারই মানিক শ্রেণীর চিত্তাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে, যারা জনগণের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে চাইছে তারা আক্রান্ত হচ্ছে বারবার। দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যতবার ভয়ংকর আঘাত এসেছে ততবারই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এই বিপদ ও আশংকার কালো মেঘ মাথার ওপর এখনও ঘনায়মান।

আমরা বিশ্বাস করি, জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই এবং সংবাদপত্র প্রতিফলিত করবে জনগণের চিন্তাস্রোতকে। আজ যখন বিচ্ছিন্নতা ও বৈরতন্ত্রের আক্রমণে জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে, যখন জাতীয় অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী মহাজনের কাছে বন্ধক দেওয়া হচ্ছে, জনজীবনকে দারিদ্র, অশিক্ষা আর অবক্ষয়ের অবসাদ যখন আচ্ছন্ন করছে, তখন সংবাদপত্রের দুশো বছর পূর্তিতে আমাদের শপথ হোক্—জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথকে সত্যের আলোয় আলোকিত করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R. N. 85 0,62 মূল্য : ১৫০ MANABMON, Jan.-March, 1982
(Office of the Registrar of Newspaper for India)

" ... যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পাঁচ বছরের ইতিহাস এক নতুন জীবনের ভিত তৈরির ইতিহাস।

এই পাঁচ বছরে শুধু যে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মর্যাদা পেয়েছে তাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নতুন উদ্যমের জোয়ার।

১২ ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। গ্রহণ করা হয়েছে কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য। একাডেমী স্থাপিত হয়েছে উর্দু ভাষার উন্নতিকল্পে। তপশিলী জাতি, উপজাতি, এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে বই, পোষাক, বৃত্তি ও টিফিন—বিনামূল্যে।

শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন সরকারী হারে। নতুন পে-কমিশনের সুপারিশ শিক্ষাজগতের কর্মীদের সামনে উন্মুক্ত করেছে উজ্জ্বল দিগন্ত। মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে তুলনা করেছিলেন—সে কথা স্মরণে রেখে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। এবং মাতৃভাষাই একমাত্র শিক্ষনীয় ভাষা হিসাবে রাখা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিসর অতিক্রম করে বাইরেও। জনগণ এখন পাচ্ছেন সরকারী ভরতুকিপ্রাপ্ত ভারতীয় সাহিত্যিকদের রচিত সুলভ সংস্করণ রচনাবলী। ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলি পাচ্ছে গ্রন্থের সরবরাহ, নবীন ও প্রবীণ লেখকেরা পাচ্ছেন পুস্তক প্রকাশের জন্য আর্থিক অনুদান, পেশাদারী-অপেশাদারী নাট্য-যাত্রা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি পাচ্ছে অর্থ সাহায্য ও পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে তৈরি হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিফলনকারী চলচ্চিত্র—প্রদর্শিত হচ্ছে শহরে গ্রামে-গঞ্জে।

এছাড়াও, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়েও বিচিত্র নতুন পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়েছে।

অপসংস্কৃতির কালো রাত্রি পেছনে রেখে এসেছে নবসংস্কৃতির সুন্দর প্রভাত। এই অগ্রগতিকে স্থায়ী করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১১৫১) '৮২

সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঃ সোমনাথ মুখার্জী কর্তৃক মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩২/১এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত।